Working Paper

SPECIAL SERIES: CHANGING VILLAGE
NO. 70 ● JUNE 2025

গ্রামীণ সংস্কৃতির পালাবদল

তানভীর শাতিল
ড. শাহাদুজ্জামান

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রামীণ সংস্কৃতির পালাবদল

তানভীর শাতিল এবং ড. শাহাদুজ্জামান

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © BIGD

প্রকাশকাল: জুন ২০২৫

প্রকাশক: BIGD, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক: নুসরাত জাহান ও মাধুরী গোস্বামী

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনা: মো: আব্দুর রাজ্জাক

ISBN | 978-984-95752-0-7

কৃতজ্ঞতা

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমাদের গবেষণায় অংশ গ্রহণকারী সকল উত্তরদাতাদের প্রতি এবং তাদের খানার সদস্যদের প্রতি যারা মাঠকর্ম চলাকালে আমাদের মাঠ গবেষকদের সময় দিয়েছেন। নিজেদের ব্যস্ততার মাঝেও তিন মাস ধরে মাঠ গবেষকদের সাথে ধৈর্য ধরে নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করেছেন। এর সাথে সাথে আমাদের কমিউনিটি গবেষক ও মাঠ গবেষকদের ধৈর্যশীল ও নিরলস প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি। সকল মাঠ গবেষক ও কমিউনিটি গবেষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল বিন্যাসের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য নিশাত তাসনিম, সাইফ শাহরিয়ার ও জান্নাতুল নাইমকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমরা আরো ধন্যবাদ জানাই বিআইজিডি'র সকলের প্রতি যারা বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদের ঋদ্ধ করেছেন। আর বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বিআইজিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইমরান মতিনকে তার ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করার জন্য।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দুই ধরনের পরিবর্তন অনুধাবিত হয়—দৃশ্যমান ও অদৃশ্য। দৃশ্যমান পরিবর্তনসমূহ যতটা সহজে অনুধাবন করা সম্ভব, অদৃশ্য পরিবর্তনসমূহ ততটাই কঠিনতম। এটি পরিবর্তনের বিমূর্ত ধারা, যা কিনা মানুষের প্রাত্যহিক আচরণের ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়। আর সেই জায়গা থেকে আমরা আমাদের গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামসমূহে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তনকে স্থানীয় মানুষ কীভাবে বোঝে তা বোঝার চেষ্টা চালিয়েছি। আর, এক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার ১০টি গ্রামে ফোকাস এথনোগ্রাফিক এপ্রোচে ন্যারেটিভ এনকোয়ারির (narrative enquiry) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে সামনে এসেছে তার মাঝে গ্রামীণ মানুষের আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি অন্যতম। মানুষ নানাবিধ পেশায় যুক্ত হচ্ছে আর মানুষের ব্যস্ততাও আগের চেয়ে বেড়েছে, সাথে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার, এই ব্যস্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অবসর সময়ও আনুপাতিক হারে কমে আসছে। এই অবসর সময় কমে আসার সাথে সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিশেষত মোবাইল ও ইন্টারনেটের বিস্তৃতি গ্রামীণ অবসর যাপন ও বিনোদনের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বিনোদনের গ্রামীণ আয়োজন, অনুষঙ্গ কিংবা যৌথতার ধরনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে, কিছু হয়তো আগের জৌলুশ হারিয়ে কোনোমতে টিকে আছে আবার একই সাথে অনেক নতুন ধরনের শহুরে অনুষ্ঠানাদি গ্রামীণ জীবনে যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। শুধু বিনোদন বা অবসর যাপনের ক্ষেত্রেই যে শহুরে চল বৃদ্ধি পেয়েছে এমন নয়, বরং সামগ্রিক গ্রামীণজীবনে গত কয়েক দশকে শহুরে চল প্রকটতর হয়ে উঠেছে। যেমন—গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, অকৃষিক্ষেত্রের বিকাশ হয়েছে, বাজারের বিস্তৃতি ঘটেছে। আর বাজারের স্বভাবেই সে নগরায়নকে উদ্বুদ্ধ করেছে তথা বৈশ্বিক বাজারের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই বৈশ্বিক বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে ‘উন্নত’, ‘আধুনিক’ হওয়ার যে তাড়না তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় গ্রামীণ সমাজে। গ্রামীণ বাজার শহরের সাথে অবকাঠামোগতভাবে যুক্ত হওয়ার পাশাপশি ভার্চুয়ালিও যুক্ত হচ্ছে বিশ্বায়নের সাথে। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সম্যকভাবে আধুনিকতার সাথে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় ঘটাতে সহায়তা করছে। আর প্রবাসী আয় আধুনিক নানান পণ্য ব্যবহার বিস্তৃত করছে। গ্রামীণ দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও পণ্যসমূহের পরিবর্তনের দিকে তাকালে আধুনিক নাগরিক পণ্যের দেখা

মেলে বেশিরভাগ গ্রামেই। মানুষের প্রাত্যহিক অভ্যাস, ব্যবহার, আচার-আচরণ, চলন-বলন নানা বিষয়ে আধুনিকতার দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

এর পাশাপাশি দেখা যায়, গ্রামীণ পারিবারিক ও সামাজিক যুথবদ্ধতা দিনকে দিন কমে আসছে। এখানে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের বহুমাত্রিক অনুঘটক বা অনুষঙ্গসমূহের মিথস্ক্রিয়া পারিবারিক কাঠামো পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। ব্যক্তির নিজের জীবনমান (বা বাস্তবতা) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার জীবিকা বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বড় (এক অর্থে প্রধান) একটা নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। বিশেষ করে, শিক্ষিত পরিবারগুলো কিংবা যাদের হাতে সাম্প্রতিক সময়ে সচ্ছলতা এসেছে, অথবা যারা জীবনের তাগিদে গ্রামীণ পরিসর থেকে নগরমুখী হচ্ছেন (নাগরিক) এবং আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই রূপান্তরের প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। উভয়ের ক্ষেত্রেই একক পরিবার গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। কেউ হয়তো তার জীবনমান ও পরবর্তী প্রজন্মের সুন্দর ও উন্নত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অভ্যন্তরীণ, মৌসুমি কিংবা আন্তর্জাতিক নানা মাত্রায় অভিবাসিত হচ্ছেন। আবার, গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যে বহুমাত্রিক পরিবর্তন হয়েছে তার ভেতর দিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে একে অপরকে সাহায্য করা এবং একজনের বিপদ-আপদের খোঁজ অন্যজন রাখার চর্চাও কমে গিয়েছে। ফলে এখন একজন অন্যজনকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নয় বরং ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা থেকে সাহায্য করতে যান। এছাড়াও সম্পর্ক স্থাপন বা যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এখন আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় সবাই, যা একভাবে আত্মকেন্দ্রিকতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠার প্রবণতাকে নির্দেশ করে।

আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তিপর্যায়ে যে মূল্যবোধের বিবর্তন তা পারিবারিক ও আর্থ-সামজিক পরিসরে পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। মূল্যবোধ আসলে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে কীভাবে টিকে থাকে বা সমাজে মূল্যবোধগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে কীভাবে বিবর্তিত হয় তার একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই।

আমাদের গবেষণায় গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিসরের এই পরিবর্তন একটা চলমান সামাজিক ঘটনা হিসেবে সামনে আসে। আর এই ঘটমান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু অনুঘটক লক্ষ্য করা যায়। তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই যে, গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বা আয় বৃদ্ধি, প্রযুক্তির বিস্তার, শিক্ষা, অভিবাসন, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি—এই বিষয়সমূহ গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিসরে পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

ভূমিকা

২০২৩ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD) বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সাম্প্রতিক কয়েক দশকে পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে জানার জন্য "চেঞ্জিং ভিলেজ" বা "গ্রাম পরিবর্তন" শিরোনামে একটি এথনোগ্রাফিক গবেষণা পরিচালনা করে। এই গবেষণায় গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনকে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত থেকে দেখা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতসমূহকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ যথেষ্ট সংকীর্ণ, কেননা পরিবর্তনের এই প্রেক্ষিতগুলি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তথাপি, প্রতিটি প্রেক্ষিতে পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে। এরই ধারাবাহিকতায়, আলোচ্য অধ্যায়ের মূল আগ্রহের জায়গা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে আবহমান সাংস্কৃতিক পরিসরে বিগত তিন-চার দশকে পরিবর্তনের স্বরূপ কেমন?—তা বোঝা।

গবেষণা প্রারম্ভিকা হিসাবে একটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে গবেষণা কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট থেকে এক্ষেত্রে সংক্ষেপে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দুই ধরনের পরিবর্তন অনুধাবিত হয়, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য। দৃশ্যমান পরিবর্তনসমূহ যতটা সহজে অনুধাবন করা সম্ভব, অদৃশ্য পরিবর্তনসমূহ ততটাই কঠিনতম। পরিবর্তনের বিমূর্ত ধারা, যা কিনা মানুষের প্রাত্যহিক আচরণের ভেতর দিয়ে প্রায়শই মূর্ত হয় আর সেই জায়গা থেকে আমরা আমাদের গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামসমূহে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তনকে স্থানীয় মানুষ কীভাবে বুঝে তা বুঝার চেষ্টা চালিয়েছি। আর এক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার ১০টি গ্রামে ফোকাস এথনোগ্রাফিক এপ্রোচে ন্যারেটিভ এনকোয়ারি (narrative enquiry) বা বর্ণনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। যার অন্যতম উদ্দেশ্য এই পরিবর্তন প্রবাহের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া। এই নিবন্ধে মূলত গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যার বড় একটি দিক হলো সংস্কৃতির পরিধি নির্ধারণ বিষয়ক দোলাচল। তবে, ঊনিশ শতকের শেষভাগে ই বি টায়লর (১৮৭১) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অধিক হারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, যেখানে বলা হচ্ছে সংস্কৃতি হল সেই জটিলসমগ্র যার মধ্যে রয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত

অন্য কোনো ক্ষমতা ও অভ্যাস। যদিও পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতির ধারণায়নের ক্ষেত্রে সংজ্ঞাগুলি বহুমাত্রায় পরিবর্তিত হয়েছে। এর মধ্যে অধিক আলোচিত একটি সংজ্ঞায় সংস্কৃতিকে বিমূর্ত এক ধারণা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন লিন্টন (১৯৩৬) মনে করেন সংস্কৃতি স্বয়ং অস্পষ্টতায় মোড়া একটি বিষয় যা সরাসরি ধরা যায় না, এমনকি যারা এতে অংশগ্রহণ করে তারাও স্পষ্টত চিহ্নিত করতে পারেন না। একইভাবে র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (১৯৪০) সংস্কৃতি বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন সংস্কৃতি শব্দটি কোনও সুনির্দিষ্ট বাস্তবতাকে বোঝায় না, বরং একটি বিমূর্ততা বোঝায় এবং এটি সাধারণত একটি অস্পষ্ট ধারণা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার, Kroeber এবং Kluckhohn মানুষের আচরণকে সংস্কৃতি থেকে আলাদা স্থানে দাঁড় করান। তাঁদের মতে,সংস্কৃতি নিজে আচরণ নয় বরং আচরণ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি বিমূর্ত ধারণা হিসেবে অবস্থান করে (White, L. A., 1959)।

Edward T. Hall (১৯৭৬) সংস্কৃতিকে হিমশৈলের সাথে তুলনাপূর্বক দেখান যে, সংস্কৃতিকে দৃশ্যত বুঝবার চেষ্টায় খুব সামান্যই অগ্রসর হওয়া সম্ভব যদি না মানুষের তথা সমাজের অবচেতন চিন্তাজগত, প্রেক্ষিত, বাস্তবতা, প্রভৃতি বিবেচনায় না নেওয়া হয়। অর্থাৎ হিমশৈলের জলের উপরের অংশটুকু দেখে এর আয়তন যতটুকু ভাবা হয়, প্রকৃত অর্থে তারচেয়ে অনেক বড় একটা অংশ পানির নিচে থাকে যা অদৃশ্যমান থেকে যায়। যেমন সংস্কৃতির ভাষা, রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের মতো সুস্পষ্ট উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণযোগ্য। আর নিমজ্জিত স্তরগুলিতে অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নিয়ম রীতি, এবং অঙ্গভঙ্গি, ইশারা কিংবা মৌন যোগাযোগের ধরন বিবিধ উপাদান অনুষঙ্গ বিরাজ করে। আর এই অদৃশ্য সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সাথে দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক বস্তু বা অনুষঙ্গের নিবিড় সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে Nobuo Ito (২০০৩) সম্পর্কটিকে পেঁচানো দড়ির সাথে তুলনা করেন। যদিওবা, একই সাথে এই সরল উদাহরণের মাঝে লুকায়িত জটিল মিশ্রতা নিয়েও সতর্ক করেন। তিনি নির্দ্বিধায় আরো মনে করেন যে, সংস্কৃতির অদৃশ্য প্রেক্ষাপট দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক বস্তুগত প্রতিফলনের পটভূমি তৈরি করে। তিনি এখানে উদাহরণ হিসেবে ধর্মীয় স্থাপত্যশিল্পের সাথে ধর্মের সম্পর্ক এবং সেই স্থাপত্যের নকশায় জড়িতদের চিন্তার জটিল সম্পর্ককে সামনে আনেন (Ito, N., 2003)। আবার যেমন, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জিটকা কোটালোভা দেখতে পান যে, একই বাংলাদেশি মুসলিম সমাজে নানাবিধ প্রেক্ষিত রয়েছে যাকে তিনি সহজাত বহুমাত্রিকতা হিসেবে অভিহিত করতে চেয়েছেন (Kotalova, J., 1996)।

বিস্তৃত অর্থে, সংস্কৃতি হল একটি সমাজের মানুষের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, জীবনধারা, রন্ধনপ্রণালী, আচরণ, শিষ্টাচারের সামগ্রিকতা। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে চলমান বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নানাবিধ সংস্কারের ফলে সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে সংস্কৃতির পরিসরের এক ধরনের সমরূপী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা আবার নব্য মার্কসবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার হিসেবে দেখা হয়। আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক পছন্দের অধিকার হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলশ্রুতিতে, বিশ্বায়নের সমরূপী প্রবাহ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় আর সাথে সাথে সংস্কৃতির সংকরায়ণও পরিলক্ষিত হয় (Choudhary, K.,2007)।

সংস্কৃতির ধারণায়নের ক্ষেত্রে এর বিস্তৃত ব্যাপ্তিকে বিবেচনায় রেখে আমরা মূলত টায়লরিয়ান সংস্কৃতির ধারণাকে আমলে নিয়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রেক্ষিতে (বিশেষত—সামজিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ, মনন, অবসর, উৎসব, বিনোদন, ইত্যাদি) কী ধরনের পরিবর্তন গত তিন চার দশকে এসেছে তা নিয়ে আমাদের আলোচনা দাঁড় করিয়েছি।

এখানে পরিবর্তনের সময়কালকে একটা আনুমানিক মাত্রায় রেখে আমাদের আলোচনা দাঁড়িয়েছে, কেননা গ্রামের মানুষরা তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনাচরণে সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গগুলোর পরিবর্তনকে সুনির্দিষ্ট সময়ের পরিকাঠামোয় এনে অনুধাবন করার চেয়ে বরং পরিবর্তনশীল সময়ে নিজেদের জীবনপরিক্রমায় প্রাত্যহিক জীবনাচরণের অভিজ্ঞতায় ভিন্নতার প্রেক্ষিত থেকে এই পরিবর্তনকে অনুধাবন করে থাকেন। তাই সবক্ষেত্রে সময়কালকে নির্দিষ্টভাবে ধরতে না পারলেও আনুমানিকভাবে ৩-৪ দশকের প্রেক্ষিত থেকে পরিবর্তনকে ধরতে চাওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। গত ৩-৪ দশক সময়টাতে গ্রামীণ জীবনের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভিবাসন, ডিজিটালাইজেশন, অবকাঠামো ও যোগাযোগ, শিক্ষা, প্রযুক্তির বিস্তার, স্থানীয় বাজার ও অর্থ প্রবাহ ইত্যাদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আর এই দৃশ্যমান দ্রুত পরিবর্তিত গ্রামীণ প্রেক্ষাপট বোঝার জন্যেই এই সময়কালের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে আমাদের গবেষণায়। তবে কিছু জায়গায় এই নির্দিষ্ট সময়কালের পূর্বের বাস্তবতার প্রেক্ষিত থেকেও পরিবর্তনকে স্থানীয়রা ব্যাখ্যা করেছেন। অদৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো নির্দিষ্ট সময় কাঠামোয় নিয়ে আসা বেশ দুরূহ একটা কাজ, যেমন—মানুষের আচরণ বা মূল্যবোধ পরিসরের পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট সময়কালের পরিকাঠামোতে আটকানো সম্ভব নয়। এটিকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে দেখলে সুবিধা যেখানে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিত থেকে বর্তমান অভিজ্ঞতার তারতম্য ঘটে।

আবার একইভাবে, গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিসর নিয়ে আলোচনার পরিধি নির্ধারণ করা বেশ কঠিন, তবুও এই অধ্যায়ে গ্রামীণ সাংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো পরিসরে আলোচনা বিস্তৃত করা হয়েছে। যেমন—বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ কৃষিভিত্তিক মূল্যবোধ, মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে মূল্যবোধ, ভোগ প্রবণতা, অবসরযাপন ও বিনোদনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বুঝতে নারীর জীবনের পরিবর্তনকে বোঝা প্রাসঙ্গিকতা পায়। কারণ, গ্রামীণ মানুষ এই পরিবর্তনকে নানাভাবে দেখে থাকে, যা মানুষের চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সংস্কৃতির সাথে জড়িত। তাই গ্রামীণ নারীদের জীবনে বিশেষত তাদের শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে এবং জনপরিসরে উপস্থিতির প্রেক্ষিতে যে পরিবর্তন হয়েছে তা আলোচনায় এসেছে। এছাড়াও জীবনমানের উন্নয়ন, শিক্ষায় আগ্রহ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জীবনধারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের প্রত্যাশার ক্ষেত্রগুলোর যে পরিবর্তন এসেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই পরিবর্তনগুলোর ক্ষেত্রে কোন নিয়ামকগুলো কীভাবে কাজ করছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতে পরিবর্তন

গ্রামের যৌথ পরিবারগুলো ক্রমশই একক পরিবারের দিকে ধাবমান। আর এখানে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের বহুমাত্রিক অনুঘটকসমূহের মিথস্ক্রিয়া পারিবারিক কাঠামো পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। ব্যক্তির নিজের জীবন (বা বাস্তবতা) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার জীবিকা বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বড় একটি নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও আরো কিছু বিষয় আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে, যেমন—সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্যের নানা উদাহরণ। একক পরিবার গঠনের পেছনে অনেকক্ষেত্রেই নারীকে দায়ী করা হচ্ছে। বিশেষ করে, শিক্ষিত পরিবারগুলো কিংবা যাদের হাতে সাম্প্রতিক সময়ে সচ্ছলতা এসেছে বা যারা জীবনের তাগিদে গ্রামীণ পরিসর থেকে নগরমুখী হচ্ছেন এবং নগরের প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক (informal) শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছেন। উভয়েরক্ষেত্রেই একক পরিবার গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। কেউ হয়তো তার জীবনমান ও পরবর্তী প্রজন্মের সুন্দর ও উন্নত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অভ্যন্তরীণ, মৌসুমি, আন্তর্জাতিক নানা মাত্রায় অভিবাসিত হচ্ছেন। ফলে গ্রামের যৌথতায় এক ধরনের চিড় লক্ষ্য করা যায়। আবার যদি গ্রামের ভেতরে পরিবারগুলোর একক পরিবারের দিকে ধাবিত হওয়ার কথা বিবেচনায় নেওয়া হয় তবে আমরা দেখতে পাই, গ্রামীণ গৃহস্থ পরিবারগুলো আগের মত সনাতনী কৃষি বাস্তবতার মাঝে নেই। কৃষির সনাতনী পদ্ধতিতে নানা মাত্রায় পরিবর্তন এসেছে, প্রযুক্তি নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, গবাদি পশুপাখি পালনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। কৃষিকাজ করতে আগে গৃহস্থ পরিবারকে যৌথ থাকার প্রয়োজন পড়তো। মুড অব প্রোডাকশনই (mode of production) গৃহস্থের যৌথ পরিবার বজায় রাখতো; প্রযুক্তির ব্যবহার এক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন এনেছে। একইভাবে, রঞ্জন সাহা (২০২৪) দেখান যে, 'আধুনিক প্রযুক্তি' কৃষিতে মানবশ্রমের ভূমিকাকে প্রান্তিক করে তুলছে। ফলে যৌথ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা কমছে।

অপরদিকে গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থাপনায়ও এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এই ভূমি ব্যবস্থাপনাতে দেখা যায় ধনী কৃষক পরিবারগুলো কৃষি থেকে সরে এসে নগরমুখী হচ্ছে কিংবা অকৃষি পেশায় আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের জমিগুলো ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছে বিভিন্ন চুক্তিতে দিয়ে দিচ্ছেন, যার ফলে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলোর সংখ্যা বাড়ছে। ধনী, বড়, যৌথ কৃষি পরিবারগুলো ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।

একইভাবে সামাজিক যুথবদ্ধতা কিংবা পারস্পরিক সহমর্মীতার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেমন—গ্রামের মানুষদের কাছে জানা যায়, মৃত্যু বা অন্যান্য সামাজিক কাজে আগে সবাইকে তাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এগিয়ে আসতে দেখা যেত। আগে কারও বাড়িতে কেউ মারা গেলে মৃতের আত্মীয়স্বজনদের লোক পাঠিয়ে খবর দেয়া হত। বর্তমানে মোবাইল ফোনে বা মাইকিং এর মাধ্যমে খবর পৌঁছে দিতে দেখা যায়। আগে সামাজিক দায়বোধের জায়গা থেকে প্রতিবেশীরা মৃতের জন্য কবর খুঁড়তে যেতেন। তবে এখন তরুণ প্রজন্ম এসব কাজে বেশী আগ্রহী নয় বলে বয়স্করা মন্তব্য করেন। অপরদিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে বয়স্কদের এখনও জানাযায় অংশগ্রহণ করার ব্যাকুলতা দেখা যায়। মৃতের বাড়ির খাবার বা অন্যান্য দায়দায়িত্ব এখনো প্রতিবেশীরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করেন। তবে আগে আশেপাশের বাড়ির লোকজন মৃতের বাড়ির লোকদের ডেকে নিয়ে তাদের বাড়িতে খাওয়াতেন, এখন এক জায়গায় আয়োজন

করে সবাইকে একসাথে খাওয়ানো হয়। রান্নার লোকের মাধ্যমে রান্না করানো হয় এবং মৃতের পরিবার এসবের ব্যবস্থা করে।

তাছাড়া দলবেঁধে গ্রামের একজনের বিপদে সবাই মিলে একসাথে কাজ করার প্রবণতায়ও পরিবর্তন এসেছে। পাড়া বা হাটিকেন্দ্রিক বসতিতে আগে বাসিন্দাদের মধ্যে যে ধরনের আন্তরিকতা কাজ করতো, তা কমে যাওয়ার নিদর্শনই গ্রামবাসীদের কথায় পাওয়া যায়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা পাই, আগে গ্রামগুলোতে কৃষিভিত্তিক যে উৎপাদন কাঠামো ছিল সেখানে একধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিলো। আর উৎপাদন ব্যবস্থায় যে বহুমাত্রিক পরিবর্তন হয়েছে তার ভেতর দিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে একে অপরকে সাহায্য করা এবং একজনের বিপদ-আপদের খোঁজ অন্যজন রাখার চর্চাও কমে গিয়েছে। ফলে এখন একজন অন্যজনকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নয় বরং ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা থেকে সাহায্য করতে যায়। এছাড়াও সম্পর্ক স্থাপন বা যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এখন আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় সবাই যা একভাবে আত্মকেন্দ্রিকতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠার প্রবণতাকে নির্দশ করে।

পরিবর্তনের জটিল পটভূমি

আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তিপর্যায়ে মূল্যবোধের যে বিবর্তন এসেছে তা পারিবারিক ও আর্থ-সামজিক পরিসরে পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। মূল্যবোধ আসলে কীভাবে টিকে থাকে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে কিংবা সমাজে মূল্যবোধগুলো কীভাবে তার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে বিবর্তিত হয় তার একটা চিত্র আমরা দেখতে পাই। মাঠকর্মের সময়ে গ্রামীণ মানুষের সাথে কথা বলে জানা যায়, ব্যক্তি তার সামাজিকীকরণের ধারাবাহিকতায় দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস, মানসিকতা, রুচি, অভ্যাস ইত্যাদি নানান বিষয়ে পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। এইক্ষেত্রে গ্রামের মানুষরা সকলেই মোটামুটিভাবে স্বীকার করে যে, তাদের মাঝে রুচির একটা পরিবর্তন এসেছে, আর এই রুচির পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা, মনোভাব, বিশ্বাস ইত্যাদির পরিবর্তন কিছুটা দৃশ্যমান । এর ফলে অদৃশ্য পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠে। যেমন—ব্যক্তির রুচির পরিবর্তনের সাথে সাথে তার পোশাক ও রূপচর্চার পরিবর্তন হয়েছে; এবং তাদের প্রতিদিনের রুটিন ও অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের মানুষের শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের নিজেদের গ্রামে বিভিন্ন আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে। আবার এলাকার বাইরে গিয়ে নানান কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। নিজের এলাকার বাইরে অভিবাসিত হয়ে নতুন পরিবেশে নতুন বিভিন্ন জিনিস, চর্চা, অভ্যাস ও জীবনযাপনের ধরনের সাথে পরিচিত হচ্ছে যা পরবর্তীতে নিজের অভ্যাসবশত কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে নিজের গ্রামে চর্চা করার প্রবণতা বেড়েছে।

গ্রামীণ দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও পণ্যসমূহের পরিবর্তনের দিকে তাকালে আধুনিক নাগরিক সকল পণ্যের দেখা মেলে বেশিরভাগ গ্রামেই, কেবল ভৌগোলিকভাবে কিছুটা দুর্গম—যেমন হাওর, উপকূলীয়, চর কিংবা নদীভাঙ্গন প্রবণ এলাকার গ্রামগুলোতে কিছুটা ব্যত্যয় ঘটে। তবে সামগ্রিকভাবে

দেখলে, গ্রামগুলোতে যোগাযোগ অবকাঠামোর (ভৌত ও ডিজিটাল) তড়িৎ পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণজীবনে দ্রুত ধাবমান এক পরিবর্তনের রূপ দেখা যায়।

মোবাইল ভূত

প্রতি গ্রামেই ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে, উল্লেখযোগ্য হারে স্মার্টফোন দেখা যায় নতুন প্রজন্মের হাতে। এক্ষেত্রে বয়স্কদের থেকে তরুণরা তথ্য-প্রযুক্তির সাথে বেশি সখ্যতা গড়ে তুলেছে। কিশোর বয়সীদের মাঝে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়া কিংবা অনলাইনভিত্তিক নানান বিনোদনের সাথে যুক্ত হওয়া নিয়ে একধরনের উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা যখন জামালপুরের রামপুরা গ্রামে ঘুরছিলাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম যে কিশোর যুবাদের ছোটছোট জটলা, গোল হয়ে বসে তারা মোবাইলে লুডু খেলছে। আবার একজনের সাথে দেখা হলো তার পায়ের স্যান্ডেলে "ফ্রি-ফায়ার" অনলাইন গেমের নাম লিখা আর তার হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথায় কালো ছোট একটা ঢাকনা, জানতে চাইলাম এটা কী? সে বলল, "এটা দিয়ে অনলাইনে গেম খেলতে সুবিধা। এটাকে ফিঙ্গার গ্লভ কয়।" সে আরও জানায় অনলাইনে গেম খেলে সে টাকা ইনকাম করে।

অপরদিকে বয়স্কদের সাথে আলাপকালে দেখা যায় তারা তরুণদের এই মোবাইল ব্যবহারকে বেশিরভাগই ভাল নজরে দেখেন না। তারা জানান তরুণ প্রজন্ম মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন ধরনের জুয়াসহ নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এব্যাপারে আলাপ প্রসঙ্গে তারা 'মোবাইল ভূতের' গল্প শুনিয়েছিলেন। "মোবাইল ভূত" কী জানতে চাইলে তারা জানান, "এক ছেলে রাতে বাড়িতে এসে তার মায়ের সাথে উল্টা-পাল্টা আচরণ করছিল, এই হেসে উঠছিল তো আবার কেঁদে উঠছিল, কখনো মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। তার মা চিন্তিত হয়ে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করেন, প্রতিবেশীরা সকলে চলে আসেন। সকলে বললো এরে ভূতে ধরছে হুজুররে ডাইকা নিয়া আসো। হুজুর এসে যখন ভূত ছাড়ানোর তদবীর করছেন তখন ওই ছেলে নিজের স্বর বিকৃত করে অচেনা এক স্বরে বলে উঠলো কালকে একটা মোবাইল কিনা দিবে, তা নাহলে আমি একে ছাড়বো না। অবশেষে তার মা সেই ভূতের আবদার রক্ষা করার শর্ত স্বীকার করে নিলে ভূত ছেড়ে যায়।" মজার ব্যাপার হলো একজন অনেকটা রসিকতার এবং আক্ষেপ মেশানো অভিব্যক্তিতে বললেন, "কী করবেন ভাই! ডিজিটাল সময়ের ডিজিটাল ভূত।"

আবার, দশম শ্রেণী পড়ুয়া এক ছাত্রীর মায়ের সাথে কথা হচ্ছিলো, তিনি জানালেন, করোনার সময়ে স্কুল থেকে শিক্ষকরা মোবাইলে ক্লাস নিয়েছেন, তাই তার মেয়েকে মোবাইল কিনে দিয়েছেন। এখন সে সারা দিন মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। তিনি বলেন, "আমি কিছু কইতে পারি না, কিছু কইলেই রাগ করে আর কয় মোবাইলে সে পড়তেছে আমারে বলে—তুমি লেখাপড়ার কী বুঝবা তুমি কি কখনো স্কুলে গেছ? আমি আর কিছু কইতে পারিনা, আমিতো স্কুলে যাই নাই, বাপ মায়ে লেখাপড়া করাইতে পারে নাই।"

নান্দনিকতার নতুন ধারণা

এরই ধারাবাহিকতায়, নিজেকে ‘সুন্দর’ করে উপস্থাপন করা, অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা, সর্বোপরি নিজের জীবনমান পরিবর্তন করার তাড়না আমরা আমাদের গবেষিত গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। গ্রামের পরিবেশ, বিশেষত মানবসৃষ্ট পরিবেশে (built envinment) যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তা লক্ষ্য করলে একটা ধারণা পাওয়া যায়। গবেষিত গ্রামে, গ্রামীণ বাড়ি-ঘরের গঠন, গৃহস্থালির আসবাবপত্র, মানুষের পোশাক, চালচলন ইত্যাদির প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের একটা চিত্র স্থানীয় মানুষের বর্ণনার পাশাপাশি আমরা মাঠ পর্যবেক্ষণের সময় প্রত্যক্ষ করেছি। মানুষ আশেপাশের কাউকে সুন্দর করে বাড়ি করতে দেখলে বা সুন্দর পোশাক পরে থাকতে দেখলে সে নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্যও তাই করার চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে সুন্দর বাড়ি বা সুন্দর পোশাকের ধারণাও নির্দিষ্ট কিছু নয় বরং প্রায় প্রতিদিনই তা পাল্টাচ্ছে। কুমিল্লার ভবানীপুর গ্রামে দেখা যায়, একটা সময় কাঠের কাজ করা বাড়ি বা ‘কাঠকাবাড়ি’ সুন্দরের একটা আদর্শ হিসেবে থাকলেও তা ধীরে ধীরে পাল্টে পাকা বাড়ি, তারপর টাইলসের ব্যবহার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তি আমরা গ্রামীণ জীবনে দেখতে পাচ্ছি। বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গ্রামগুলোতে বাহারি রঙ ও নকশায় সজ্জিত বাড়ি চোখে পড়ে, বিশেষ করে প্রবাসী-অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে। প্রবাসজীবন শেষে ফিরে আসা ব্যক্তিদের অভিরুচির প্রতিফলন ঘটে তাদের বাড়ির নকাশাগুলোতে।

এ পরিবর্তনের পেছনে যেমন মানুষের চিন্তা জগতের পরিবর্তন কাজ করছে, তেমনি তার চারপাশের সমাজও পরোক্ষভাবে তাকে প্রভাবিত করছে তার নিজের মধ্যে এইসব পরিবর্তনগুলো ধারণ করতে। ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতা সামাজিক মূল্যায়ন কিংবা সম্মান নির্ধারণে ভূমিকা রাখে, সামাজিক মননে এটা প্রকটভাবে দেখা যায়। এক্ষেত্রে গবেষণাকালীন সময়ে স্থানীয় অনেকের সাথে আলাপের সময় তাদের একজনকে বলতে শুনেছি, “এখন সমাজে টাকারই দাম। টাকা আছে আপনার দাম আছে, টাকা নাই আপনার দাম নাই। টাকা হইলে সব পাওয়া যায়।”

গ্রামের মানুষের বয়ানে নানা সময়ে উঠে এসেছে যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চাহিদার পরিবর্তনের সাথে ধীরে ধীরে তার চারপাশেরও পরিবর্তন হয়েছে। আগে একই ঘরে একপাশে গবাদিপশু রেখে অন্য পাশে নিজেরা থাকা খুব স্বাভাবিক হলেও এখন আর তা কেউ করে না। কারণ চারপাশের মানুষ তাকে কীভাবে দেখছে তাও এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে বাড়ির বিন্যাস পাল্টাচ্ছে, ঘরে কক্ষ সংখ্যা বাড়ছে, গবাদিপশুর জন্য আলাদা ঘর করা হচ্ছে এবং গোসলের স্থান ও টয়লেটের ধরন পাল্টাচ্ছে। মাঠকর্মের সময় গ্রামের চায়ের দোকানে আলাপকালে একজন ব্যক্তি বলেন,

> “আমার ছেলে এখন ঢাকায় থাকে সেখানে সে চাকরি করে, বউ-পুলাপান নিয়া ওখানেই থাকে। তারা শহরে একটা পরিবেশে থাকে। তাদের শহরের বন্ধু-বান্ধব আছে। তারা যখন আমার বাড়িতে বেরাইতে আসে তখন কি আর যেমন তেমন থাকা যায়? তারা কী ভাববে? এরা কেমন গেরাইম্যা (গ্রামীণ) কোন কিছু শিখে নাই! এখন দিন বদলাইছে, মানুষ শিক্ষিত হইছে, মানুষের চাহিদা (রুচি) বদলাইছে।

আবার, রামপুরা গ্রামের একজনের ভাষ্য বিষয়টিকে বুঝতে সহয়তা করে, তিনি বলেন, "বর্তমানে মানুষ সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চায় এবং সেটা অন্যকে দেখাতে চায়। যদি কেউ গবাদিপশুর সাথে একই ঘরে থাকে তাহলে তার মনের মধ্যে এই চিন্তা আসে যে মানুষজন সেটাকে কীভাবে দেখছে। এভাবে একসাথে থাকলে মানুষ বলবে একটা ঘরে গরু ছাগল রেখেছে আবার ওরাও থাকে, ওইখানে খায় কীভাবে? থাকে কীভাবে? বর্তমানে মানুষের নিজের দেখার চাইতে এখন অন্যের দেখাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে।"[১] এখন সম্মান পাওয়ার জন্যও মানুষ তার "পরিবেশ তৈরি করায়" মনোযোগী। তাছাড়াও সম্মানের সাথে জড়িত আছে মেয়ের বিয়ে দেয়া কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক। এক্ষেত্রে একজন তার নিজের জীবন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বলেন, "মানুষের কাছে সম্মান পাবার জন্য ও ঘরে একটি মেয়ে আছে, ভবিষ্যতে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য হলেও ঘর ও ঘরের আসবাব সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। যেন লোকে ভালো বলে।"[২] গ্রামের মানুষের চিন্তাভাবনায় আশেপাশের সাথে তাল মিলিয়ে, ভালো ও সুন্দরভাবে থাকার অদৃশ্য এক "প্রতিযোগিতার প্রবণতা" আমরা গ্রামগুলোতে দেখতে পেয়েছি। এই প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ সমাজে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে—এমন একটি ধারণা পাওয়া যায়, পাশাপাশি বাজার বিস্তারের একটা প্রেক্ষিত চলে আসে।

ব্যক্তির সামর্থ্য আর ভোগের পরিবর্তন

মানুষের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে এই কথাটার সাথে গ্রামীণ জীবনে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার একটা যোগসূত্র অনুধাবন করা যায়। গ্রামের ভেতরে মানুষের নানা ধরনের আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। উদাহরণ সহজেই দেখতে পাওয়া যায়, যেমন, মাঠকর্মের সময়ে আমরা গ্রামগুলোতে মানুষদের একাধিক পেশার সাথে যুক্ত থাকতে দেখতে পেয়েছি। তাদের সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে যে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবসর কমে এসেছে কেননা তারা সকলেই যারযার বাস্তবতার প্রেক্ষিত থেকে নানাবিধ আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। এখন আর কেউ বসে থাকে না, গ্রামে কিছু না করতে পারলে শহরে পাড়ি জমায়। যার ফলে গ্রামের মানুষের হাতেও অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে গত কয়েক দশকে। এরই উদারণ হিসেবে গ্রামের ভিতর নানান পণ্যের সমাহারে সজ্জিত ছোট ছোট দোকান চোখে পড়ে আর সেই দোকানগুলোতে ক্রেতা গ্রামের আশেপাশের মানুষরাই। আর গ্রামীণ মানুষের এই অর্থনৈতিক সামর্থ্যের পরিবর্তনের সাথে তার চাহিদা ও নান্দনিকতার ধারণাতেও পরিবর্তন এসেছে। ব্যক্তির ভোক্তা হয়ে উঠার পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে, গ্রামীণ মানুষের পোশাক, রূপচর্চায় এবং অন্যান্য দৈনন্দিন পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মাঠকর্মের সময়ে স্থানীয়দের সাথে আলাপের প্রেক্ষিতে জানা যায়, ৩০-৪০ বছর আগে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই একটা বা দুইটা শার্ট ব্যবহার করতো। কোথাও বেড়াতে যাওয়া বা কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রয়োজন হলে সাধারণত শার্ট পরতো। সেক্ষেত্রে নিজের শার্ট না থাকলে অন্য কারও থেকে ধার নিয়ে শার্ট পরার প্রচলনও ছিল। কিন্তু এখন সেই প্রচলন নাই বললেই চলে, প্রত্যেকেরই একাধিক পরিধেয় আছে। পাশাপাশি হাফ

হাতা টি-শার্ট ব্যবহারের প্রচলনও বেড়েছে। বাচ্চারা পূর্বে খুব বেশি জামাকাপড় পরে না থাকলেও বর্তমানে ছোট থেকেই বাচ্চাদের কাপড় পরিয়ে রাখার প্রচলন দেখা যায়। আগে হয়তো ধনী বাচ্চাদের সবসময় কাপড় পরিয়ে রাখা হত, কিন্তু এখন সব বাচ্চাদেরই কাপড় পরিয়ে রাখা হয়। বড়দের ক্ষেত্রেও আগে দরিদ্রদের খালি গায়ে থাকতে দেখা যেতো, আর এখন সকলের গায়ে জামা আছে। তিন চার দশক আগেও গ্রামের অনেক মানুষ জুতা বা স্যান্ডেল ব্যবহার করতো না। এক্ষেত্রে হাওড়ের গ্রামের একজন বলেন "আগে ছোটরা তো জামা-প্যান্টই পরেনি, লেংডালুংডা থাকতো। আর এখন ল্যাংডা কী বস্তু তা বোঝে না। এখন একদম কোলের বাচ্চা থাকতেই জামাকাপড় পরাইয়া রাখে। আগের মেয়েরা সবাই শাড়ি পরতো। এখন মেয়েরা শাড়ি পরে না, সালোয়ার কামিজ পরে।"[৩] আমরা গ্রামগুলো ঘুরে বেড়ানোর সময়ে অনেক জায়গাতেই গ্রামের দোকানগুলোতে বাচ্চাদের ডায়পার বিক্রি হতে দেখতে পাই, যা নিয়ে স্থানীয় একজন আলাপকালে বলেন, "আগে তো বাচ্চাদের ডায়পার প্যান্ট পড়াইতো না, কাঁথা ব্যবহার করতো মায়েরা। এখন ডিজিটাল সময় নতুন নতুন কত কিছু আসছে।"

অপরদিকে, নারীদের জামাকাপড়ে একটা পরিবর্তন এসেছে যেমন—রামপুরায় স্থানীয়দের মতে, ৩০-৪০ বছর আগে মেয়েরা বিয়ের আগে থ্রিপিস পরতো এবং বিয়ের পর শাড়ি পরতো। পরবর্তী সময়ে থ্রিপিস মেয়েদের সাধারণ পোশাকে পরিণত হয় এবং শাড়ির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। দৈনন্দিন পোশাক হিসাবে ম্যাক্সির ব্যবহারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এ বিষয়ে আমাদের একজন উত্তরদাতা বলেন, "এটার পেছনে প্রধান কারণ হলো ইসলামিক দৃষ্টিকোণ। শাড়ি এবং ব্লাউজ পরলে শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখা যায়। মূলত এই কারণেই তারা শাড়ি থেকে থ্রিপিসে এসেছে। আর যে সকল নারীর একটু বয়স বেশি হয়ে যায় তারা থ্রিপিস এর পরিবর্তে ম্যাক্সি পরে। আরো একটা কারণ সেটা হচ্ছে শাড়ির থেকে থ্রিপিস পরলে কাজকর্ম করতে সুবিধা হয়। কাপড় কাচা, শুকানো এগুলো শাড়িতে ঝামেলা বেশি।"[৪]

একইভাবে, রূপচর্চার অংশ হিসেবে মানুষ গায়ে মাখার উপকরণ (তেল, লোশন ইত্যাদি), পারফিউম, অঙ্গসজ্জার উপকরণ (মেহেদি, আলতা, নেইলপলিশ ইত্যাদি) এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপকরণকে (সাবান, শ্যাম্পু, গুড়ো সাবান ইত্যাদি) চিহ্নিত করেছে। পূর্বে অনেকে মাটি ব্যবহার করে শরীর এবং চুল পরিষ্কার করতো। গবেষিত গ্রামগুলোতে মোটাদাগে জানা যায়, নয়াপাড়ায় পাহাড়ের মাটি, কাশিপুর-ভবানীপুরে সাধারণ মাটি এবং রামপুরায় কালো এঁটেল মাটি পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহার করা হত। পাশাপাশি কাপড় পরিষ্কারের জন্য সাধারণ ছাই এবং রামপুরা গ্রামে কলা গাছের শুকনো পাতা পুড়িয়ে এক ধরণের ছাই ব্যবহার করা হত। পরবর্তীতে তিব্বত ৫৭০ সাবান হিসেবে প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয় যা একই সাথে গায়ে দেয়া, মাথা ধোয়া ও কাপড় পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা হত। তবে সাবানের বিস্তৃত ব্যবহার শুরু হয় "পচা বল" সাবানের মাধ্যমে। একটি সাবানকে কেটে কয়েক টুকরা করে বিক্রি করা হত। বল সাবান আসার পর কাপড় পরিষ্কারের এবং গায়ে মাখার সাবান আলাদা হয়ে গেল। তিব্বত ৫৭০ তখন শুধুমাত্র গায়ে মাখার জন্য এবং বল সাবান কাপড় পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা শুরু হল। তখন 'বাংলা সাবান'ই একমাত্র সাবান ছিল। বাংলা সাবান বলতে কাপড় কাচার সাবানকে নির্দেশ করেছেন গ্রামের মানুষজন।

তাদের কাছে আরো জানা যায়, বিদেশি বা সুগন্ধিযুক্ত সাবানের প্রচলন শুধুমাত্র অবস্থাসম্পন্ন ঘরগুলোতেই ছিল। পরবর্তীতে লাক্স সাবানের মাধ্যমে বিদেশি সাবান ও সুগন্ধিযুক্ত সাবানের বহুল ব্যবহার শুরু হয়। প্রবাসীবহুল গ্রাম ভাবানীপুরে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়, ১৯৭৮-৭৯ সালের দিকে ঐ গ্রামের দু-এক জন করে প্রবাসে যাওয়া শুরু করেছে, এবং সেই সময়ে প্রবাসী পরিবারগুলোতে অভিবাসীদের মাধ্যমে শ্যাম্পুর ব্যবহার পরিচিতি পায়। প্রবাসীরা বিদেশ থেকে শ্যাম্পু পাঠিয়ে কীভাবে তা ব্যবহার করতে হবে তা বুঝিয়ে দিত। একভাবে বলা যায়, তাদের হাত ধরেই মূলত গায়ে মাখার সাবান থেকে চুল পরিষ্কারের শ্যাম্পুকে আলাদা করে ব্যবহার করা শুরু হয় ঐ গ্রামে।

পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামগুলোর প্রেক্ষিতে দেখা যায়, কালের পরিক্রমায় কাপড় পরিষ্কারের জন্য ছাইয়ের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়, বল সাবানের পাশাপাশি কাপড় পরিষ্কারের জন্য নতুন সাবান আসে এবং পাশাপাশি গুড়ো সাবানের ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে। তাছাড়া, বর্তমানে মুখ পরিষ্কারের জন্য ফেসওয়াশ ব্যবহার করা হয়। পূর্বে ছেলেদের এই ব্যাপারে আলাদা আগ্রহ বা উপকরণ না থাকলেও বর্তমানে ছেলেরাও আলাদা জেন্টস ফেসওয়াশ ব্যবহার করছে। মেকআপের ব্যবহার এখন সাধারণ ও বহুল প্রচলিত। বিয়ের সময় বাড়িতেই আগে এসব দিয়ে কনেকে সাজানো হলেও এখন পার্লারে যেয়ে কনেকে সাজানো হয়। আগে গাছের মেহেদি পাতা শীলপাটায় বেঁটে হাতে দেয়া হত। এখন এর বদলে টিউব মেহেদি ব্যবহার করা হয়। গাছের মেহেদি পাতা এখন মহিলাদের চুলে এবং পুরুষের চুল ও দাঁড়িতে দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। মোদ্দাকথা, মানুষের সামর্থ্য বেড়েছে আগের তুলনায় যেমন ঠিক তেমনই বৃদ্ধি পেয়েছে বাজারের বিস্তৃতি। বাজার বিস্তারের ফলে বাহারি পণ্য সুলভ হয়ে উঠেছে।

'কোন কাজই শরমের না'

সামাজিকভাবে মূল্যায়িত হওয়ার কিংবা নিজের অবস্থার উন্নতি করার প্রবণতা সকলের মাঝেই লক্ষ করা যায়, কেননা এখন গ্রামে নানা ধরনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। নিজের চারপাশের পরিবেশ তৈরি করাকে গ্রামের মানুষ এখন অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সেজন্য তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়ছে। আমরা দেখেছি যে, মানুষ অধিক আয়ের চিন্তা করছে এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। কয়েক দশক পূর্বে যেসব বিষয়কে গ্রামে হেয় করা হত, তা এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা হয়। যেমন, সুনামগঞ্জের কাশিপুর গ্রামের স্থানীয় একজন বাসিন্দা বলেন, "আগে কাম করা শরম ছিল, ব্যবসাও শরম ছিল। শিদলের ব্যবসা, পানের ব্যবসাকে বলতো গোলাম জাতি, ছোটলোকেরা করে। আর এখন ব্যবসা হালাল, শরম নাই"[৫] আরও বলেন: "আগে মানুষ দরকার হলে জমি-জমা বিক্রি করে খেয়েছে তবুও বাইরে কাজ করতে যায় নাই। বাইরে গিয়ে কাজ করাকে লোকে ভাবতো শরমের কাজ। এখন নারীপুরুষ সকলেই ভোলাগঞ্জ বা বাইরে কাজ করতে যায়।"[৬] তার মতে মানুষ এখন বসে না থেকে কীভাবে কাজ করা যায় বা আয় করা যায় তাতে বেশি গুরুত্ব দেয়।

প্রাত্যহিক রুটিনের পরিবর্তন

একইসাথে গত কয়েক দশকে মানুষের অভ্যাস, অবসর সময় এবং দৈনন্দিন রুটিনেও পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্বের 'প্রকট কৃষিনির্ভর' সামাজিক বাস্তবতায় বেশিরভাগ পুরুষই রাত থাকতেই ঘুম থেকে উঠে মাঠে যেত। ভোরে ফজরের আযানের আগে, রাত এক প্রহর বাকি থাকতেই মাঠে যেয়ে কাজ করা শুরু করতো। পশ্চিম কাশিপুর গ্রামের একজন জানান, "আগে ফজরের আগে ঘুম থেকে উঠে হাওরে যাইতো। ফজরের আযানের আগে যে তারা থাকতো তাকে 'যাইরা' তারা বলে। সেই তারা দেখে ঘুম থকে উঠতো। এখন সূর্য না উঠলে ঘুম থেকে উঠে না। আযান দিলে তো উঠেই না। আগে এক প্রহর রাত থাকতেই মানুষ হাওরে গেছে।"[৭] অন্যদিকে মহিলারা খুব ভোরবেলা উঠে রান্না শুরু করতো এবং দিন শুরু হওয়ার পর ভাত এবং গৃহপালিত পশু নিয়ে মাঠে যাওয়া, ঘর বাড়ি দেখাশোনা করা, পরবর্তী রান্নার জোগাড় করতো। দুপুরে গোসল ও খাওয়ার পর তারা পাটি বুনতো বা কাঁথা সেলাই করতো কিংবা অন্যান্য গৃহস্থকর্ম বা কৃষিকাজেসময় ব্যয় করতো। রাতের রান্না শেষ করে তারা পরেরদিন সকালের রান্নার আয়োজন গুছিয়ে রেখে তারপর ঘুমাতে যেত। বেশিরভাগ লোকই তখন এশার নামাজের পর ঘুমিয়ে যেত। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে সকালে দ্রুত ঘুম থেকে উঠে কাজ শুরু করতে চাইতো।

কিন্তু বর্তমানে মানুষের ঘুম থেকে ওঠার সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। এখন সূর্য ওঠার আগে খুব কম লোকই ঘুম থেকে উঠে আর তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যায়। গ্রামের দোকানগুলোতে মানুষ রাত ৯-১০ টা পর্যন্ত আড্ডা দেয়, টিভি দেখে, চা খায়। কুমিল্লার ভবানীপুরের একজন বাসিন্দা বলেন, "আগে মানুষজন এশার নামাজ পড়তো, এরপরে ভাত খাইয়া শুইয়া পড়তো। এখন তো মনে করেন এশার নামাজ পড়বো, বাড়িত গিয়া ভাত খাইয়া মার্কেটে আবার আসবো। তারপরে রাত ১২/১ টা পর্যন্ত ঘুইরাফিরা বাসায় গিয়া ঘুম দিবো।"[৮] সারাদিন কাজের শেষে লোকজন এখন এশার নামাজের পর ঘুমিয়ে পরেনা, বরং গভীর রাত পর্যন্ত মোবাইল, টেলিভিশন, আড্ডা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনোদনের সাথে যুক্ত থাকে। অন্যদিকে মহিলারাও এখন সকালে ৮টার কাছাকাছি সময়ে ঘুম থেকে উঠে সকালের খাবার তৈরি করে, বাচ্চাদের স্কুলের জন্য প্রস্তুত করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্কুলে দিয়ে আসে। অবসর সময়ে তারাও টেলিভিশন, মোবাইল বা ইন্টারনেটে বিনোদনের সাথে যুক্ত থাকে। বর্তমানে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই ঘুমাতে যাওয়ার এবং ওঠার সময়, দিনের কাজের সময় ও পরিমাণ এবং বিনোদনের সময়ের ধরনেরও পরিবর্তন হয়েছে।

মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, ও চর্চায় পরিবর্তন

মানুষের আচরণের পেছনে নানা রকমের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ কাজ করে। আগে মানুষ জিন-ভূতে বিশ্বাস করতো। আগে গাছপালা অনেক বেশি ছিলো। প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, এসব বড় বড় গাছে অনেক জিন-ভূত বাস করে। এছাড়া বিভিন্ন বিশেষ সময়ে নববধূ ও সন্তানসম্ভবা মহিলাদের বাইরে যেতে দেয়া হত না।

এছাড়াও, গর্ভকালীন সময়ে নানান ধরনের বিষয়ে নিষেধ করা হত। এইসব বিশ্বাস এবং বিশ্বাসকেন্দ্রিক চর্চাগুলোর প্রচলন এখন খুবই কমে এসেছে। এক্ষেত্রে জামালপুরের রামপুরা গ্রামের একজন বলেন, "এখন মানুষের মনে করে জিন-ভূত সব চলে গেছে। এখন আর এসব নাই। আগে বটগাছ, তেঁতুল গাছ, হিজল গাছ, কড়ই গাছ, শ্যাওড়া গাছ এরকম গাছে ভূত থাকতো বলে মানুষ বিশ্বাস করতো। এখন এসব গাছপালাই আর খুঁজে পাওয়া যায় না ভূত থাকবে কোথায়? মানুষজন আগে একদম দুপুরবেলা কিংবা সন্ধ্যাবেলা এসব অনেক জায়গা আছে যেগুলোতে যেত না। নির্দিষ্ট সময়গুলোতে নারীদের মাথার চুল খুলে ঘর ঝাড়ু দেওয়া যাবে না বা মাছ কাটা যাবে না, এরকম চিন্তা ভাবনা ছিল মানুষদের মধ্যে এখন আর নাই বললেই চলে। নতুন বউদের দুপুরবেলা বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না, সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না, নতুন বউয়ের কাপড়চোপড় বাড়ির বাইরে শুকাতে দেওয়া যাবে না, তারা অমাবস্যার সময় মাছ কাটতে পারবে না, ইত্যাদি। গর্ভবতী মেয়েদের জন্য অমাবস্যার সময় মাছ কাটা যাবে না, এই সময় মাছ কাটলে বাচ্চা ঠোঁট কাটা বা আঙ্গুল কাটা হবে। পুকুরে গরম ছাই ফেলতে দিত না, আগুনওয়ালা ছাই ফেলে দিলে ছ্যাত করে একটা শব্দ হয় তাতে করে গর্ভের বাচ্চার কোথাও পুড়ে যাবে বলে মনে করা হতো। এসব এখন আর নাই তবে কিছু কিছু মানুষ এখনো এসব পালন করে খুব অল্প পরিসরে। বিশেষ করে যেসব বাড়িতে বৃদ্ধ মানুষ আছে। তারা এসব পালন করার কথা বলে।

এর পাশাপাশি যদি লোকজ চিকিৎসা কবিরাজ, ওঝা কিংবা ব্যক্তিগতভাবে নানা গাছন্ত ঔষধ সম্পর্কে জানা মানুষের সংখ্যাও কমে এসেছে গ্রামগুলোতে। মানুষের বিশ্বাসের জায়গায় একটা পরিবর্তনের হাওয়া লক্ষ্য করা যায়। এর পেছনে মানুষের সামর্থ্য, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার প্রসার, গ্রামীণ ঔষধের দোকান, শিক্ষা, সচেতনতা সহ বিভিন্ন বিষয় ভূমিকা রেখেছে। এখন বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের কাছে কিছু ঔষধ রাখে এবং প্রয়োজনে গ্রামেই থাকা দোকান থেকে নিয়ে নেয়। এর ফলে গ্রামীণ জীবনে ওঝা, কবিরাজ ও ঔষধি গাছের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ এই বিশ্বাস, চর্চাগুলো কমে গেলেও এখনো সীমিত আকারে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তনের পেছনে চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার, গণমাধ্যম, তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার ইত্যাদি ভূমিকা রেখেছে বলে গ্রামবাসীরা মনে করেন।

কৃষক চৈতন্যে পরিবর্তন

গ্রামের সাথে কৃষিকে যুক্ত করে দেখার প্রবণতা অনেক আগে থেকে চলে আসছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে গ্রাম গবেষণায় ঔপনিবেশিক শাসনকার্য পরিচালনার প্রয়োজন থেকে গ্রামীণ সমাজে নানা ধরনের পরিসংখ্যানিক জরিপ পরিচালনা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামো, কৃষিব্যবস্থা, কৃষি অর্থনীতি ইত্যাদিকে স্বতন্ত্র একটা বিষয় হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে, আবার সমাজবিজ্ঞানে নগরগবেষণার শুরুর দিকে গ্রামকে নগরের বিপরীতে রেখে কৃষিভিত্তিক সমাজ হিসেবে দাঁড় করানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে গ্রামকে কৃষিভিত্তিক আর নগরকে শিল্পায়িত সমাজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আবার একই সাথে দেখা যায় কৃষি উৎপাদন কাঠামোকে নানান সময়ে স্বতন্ত্র একটি ব্যবস্থা হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে,

যেখানে কৃষকের মানসিকতাকে বাণিজ্যিক মানসিকতা থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়, যেমন রুশ কৃষি অর্থনীতিবিদ চায়ানভ মনে করেন কৃষক তার পরিবারের খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য ফসল ফলায়, মুনাফা লাভের জন্য নয় (Chayanov, 1931)। অপরদিকে সমসাময়িক সময়ে, ১৯৩০ সালে মার্কিন নৃবিজ্ঞানী রেডফিল্ড ম্যাক্সিকান গ্রামীণ সমাজে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম (১৯৪১ সালে প্রকাশিত) শেষ করে দেখান, গ্রাম আধুনিক নগরের সাথে বাণিজ্যিক প্রেক্ষিত থেকে সংযুক্ত তথা বাজার অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে যুক্ত। আবার একই সাথে তিনি এখানকার কৃষক সমাজকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি "অ-আধুনিক" বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখতে পান। তিনি নাগরিক সমাজের সাথে কৃষক সমাজের সম্পর্কের জায়গাটিকে একইসাথে 'বিচ্ছিন্নতা'' ও "নির্ভরশীলতা"র প্রেক্ষিত থেকে যুক্ত হিসেবে দেখেন। তিনি মনে করেন, নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে একটি বৃহত্তর সমাজের উপর নির্ভরতার কারণে কৃষক সমাজ আদিম সমাজ থেকে আলাদা। বৃহত্তর সমাজ কৃষক সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নানাভাবে দমিয়েও রাখে আর গ্রামকে বাজারে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাইরের সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্কে যুক্ত করে। স্থানীয় বিশ্বাসের সাথে বৃহৎ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি , বিবেচনা , বাজার সম্পর্কের প্রেক্ষিতসহ নানা বিষয়ের সংমিশ্রণ থেকে কৃষক সমাজের মূল্যবোধ উদ্ভূত হয়। কৃষক সমাজের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য হিসাবে কৃষকদের মাটির সাথে সম্পর্ক, বসবাসের ধরন, এবং নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে পরিবার বা সম্প্রদায়ের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া, এবং সৌম্য ও নৈতিকতা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে (Redfield, R.,1956)।

আবার উলফ তার কাজে কৃষক সমাজকে "আদিম সমাজ" ও "শিল্পোন্নত সমাজ" এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা বাস্তবতায় দেখতে পান, এবং তিনি মনে করেন কৃষকের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো পরিবারের চাহিদা মেটানো আর বাণিজ্যিক উৎপাদন হলো গৌণ (Wolf, 1966)। তবে সময়ের পরিক্রমায় গ্রামীণ সমাজ শহুরে সমাজের আদলে পরিবর্তিত হচ্ছে নানা প্রেক্ষিত থেকে আর এরই ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে আর কৃষিতে যুক্ত হয়েছে নানান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে বাংলাদেশের কৃষি প্রেক্ষিত থেকে দেখা যায় সবুজ বিপ্লবের সময় হতে বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন ও বিনিয়োগ নির্ভর কৃষির প্রসার ঘটেছে, ফলশ্রুতিতে কৃষিকাজ নানাভাবে বাজারনির্ভর হয়ে উঠেছে। এই প্রযুক্তিনির্ভরতা কৃষির ধরন ও উৎপাদন সম্পর্কের মাঝেও পরিবর্তন নিয়ে এসেছে যেমন, তেমনিভাবে কৃষকের মাঝে ধনতান্ত্রিক প্রবণতার উদ্ভব ও বিস্তার লক্ষ্য করা যায় (আদনান, ২০২২; পার্থ, ২০২৪)।

আমাদের গবেষণার প্রেক্ষিত থেকে দেখা যায়, কৃষিকাজ গ্রাম বাংলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ার দরুন নিজেদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য চাষাবাদ করার মানসিকতা ও প্রবণতা গ্রামের মানুষের মাঝে এখনো লক্ষ্য করা যায়। তবে, তাদের নিজের পরিবারের বাৎসরিক খোরাকি মেটানোর জন্য নিজেরা ধান সিদ্ধ করা, শুকানো, ধান ভানা ইত্যাদি দীর্ঘ 'শ্রমঘন' প্রক্রিয়া শেষে নিজের ঘরের চাল তৈরি করে খাওয়ার প্রবণতা কমে এসেছে। কেননা গ্রামে এখন অনেক পরিবার খুঁজে পাওয়া যায় যারা নিজেদের উৎপাদিত ধান সব বিক্রি করে দেয় আর পরবর্তীতে বাজার থেকে চাল কিনে খায় যা দুই-তিন দশক আগে মানুষ চিন্তা করতে পারতো না। কোনো গৃহস্থ পরিবার বাজার থেকে চাল কিনে খায়!—এটাকে সামাজিকভাবে অপমানজনক দৃষ্টিতে দেখা হতো। এখন মানুষ অটোরাইস মিলে ছাটাই ও পলিশ হওয়া চাল খায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়

কৃষকের খোরাকিও এখন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আওতাভুক্ত হয়ে উঠছে।

আমরা গত কয়েক বছরে এই জায়গায় কিছু পরিবর্তন দেখতে পাই। প্রথমত, পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কৃষিকাজ এখন উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে আয় করার জন্য করা হয়। পাশাপাশি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের জন্যও কৃষিকাজ করা হয়। ভবানীপুরে আমরা দেখতে পাই, ধান চাষের পাশাপাশি মাছ চাষ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মাছ চাষ করাই হয় মূলত বাজারজাত করার জন্য। এখানকার ধানের জমিতেও পুকুর করা হচ্ছে, অথচ আগে ধান চাষ এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। রামপুরায় কৃষকরা উচ্চফলনশীল ও দেশি দুইজাতের ধানই চাষ করে। তাদের কাছে জানা যায় তাদের গ্রামে এখনো কিছু পরিবার আছে যারা দেশি ধান নিজেদের খাবারের জন্য চাষ করেন এবং উচ্চ ফলনশীল ধান বিক্রি করার জন্য চাষ করে থাকে। তাদের মতে, তারা সবাই আগে দেশি জাতের ধান চাষ করতো। দেশি ধান খেতে ভালো এবং স্বাদ বেশি হওয়ায় তারা নিজেদের খাবারের জন্য এখনো দেশি ধান চাষ করতে আগ্রহী কিন্তু দেশি ধানের উৎপাদন কম হওয়ায় তারা উচ্চ ফলনশীল জাত চাষ করে যাতে তা বিক্রি করা যায়।

সামজিক দায়বদ্ধতাঃ "ঢেমি" ধান

গ্রামীণ কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক মূল্যবোধগুলোতে বাণিজ্যিক হাওয়া লাগতে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে সুনামগঞ্জের পশ্চিম কাশিপুর গ্রামে "ঢেমি ধান" নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন এসেছে তা একটি কেইস হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে। "ঢেমি ধান" হলো ধান পাকার পর 'কাছি' (কাস্তে) দিয়ে কাটার পর ধান গাছের গোড়া থেকে পরবর্তীতে আবার নতুন করে পাতা গজায়। আর এই নতুন পাতার ধান গাছ পূর্ববর্তী গাছের তুলনায় নাজুক হয় আর এই নতুন গাছ থেকে যে ধান হয়, সেটাকেই কাশিপুরে ঢেমি ধান বলে। ঢেমি ধান মূলত সাধারণ ধানের তুলনায় অপুষ্ট ও ছোট হয়। সেখানকার বড় কৃষক কিংবা যারা ধান তুলতে পেরেছেন তাদের জন্য এই ধান কাটাকে সামাজিকভাবে অসম্মানের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হত। ফলে দরিদ্র মানুষ, 'আবাদী' (যারা অন্য অঞ্চল থেকে সেখানে গিয়ে বসতি করেছেন এবং তাদের চাষের জমিই নেই) বা যারা ফসল করতে পারেন না, তারা সেই ধান সংগ্রহ করতেন। কিন্তু বর্তমানে এই সামাজিক বিবেচনা প্রায় দেখা যায় না। 'ঢেমি ধান' পশ্চিম কাশিপুর গ্রামে হতদরিদ্র মানুষদের হক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সেখানে এখন গ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু হওয়া 'হাঁসের উঁরা' বা খামারে খাবার জোগান দেয়ার জন্য জমির মালিকরা এখন "ঢেমি ধান" নিজেরাই কেটে নেন তাদের হাঁসের খামারে হাঁসকে খাওয়ানোর জন্য। তবে বর্তমানে ঢেমি ধান আগের মতো মাঠে দেখা যায় না, ঢেমি ধান কমে আসার পেছেনের কারণ হিসাবে গ্রামের মানুষরা হার্ভেস্টরের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। তারা মনে করেন, হার্ভেস্টরের মাধ্যমে ধান কাটার ফলে যে উচ্চতায় ধান কাটলে আবার কুশি (নতুন পাতা গজানো) দেয় সেই উচ্চতা আর থাকে না ফলে ঢেমি ধানও হচ্ছে না আগের মতো। গ্রামগুলোতে আমরা আরও জানতে পারি, আগে বাড়ির পাশে চাষ করা শাক-সবজি বেশি হলে তা পড়শি বা আত্মীয়দের দেয়া হত। কিন্তু বর্তমানে এমন উদ্বৃত্ত সবজি বা ফল বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

একইভাবে, গ্রামের প্রবীণদের কাছে জানতে পাওয়া যায় আগে কৃষকরা জমিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রয়োগ করাকে ভালো চোখে দেখতো না। বলা হত এসব সারে জমির ক্ষতি হবে। জমির উর্বরতা নিশ্চিত করার জন্য জমিকে কয়েকটা ফসলের পর 'জিরানি' বা বিশ্রাম দেয়া হত। জমি, ফসল ও কৃষকের মাঝে তখন একধরনের "আত্মিক সম্পর্কের" ধারণা আমরা তাদের বয়ান থেকে পাই। তারা বলেন বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে এই 'জমি জিরানি' দেয়ার প্রথা উঠে গেছে। এই প্রেক্ষিতে যে বিষয়টি গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক অনুধাবন থেকে উঠে আসে তা হলো দেশিয় জাত হারিয়ে হাইব্রিড জাতের ধানে তাদের ভাতের অভাব দূর হলেও আগের তুলনায় খাবারের পুষ্টিমান কমেছে, যা নিয়ে একটা আক্ষেপ গ্রামের মানুষের মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কুমিল্লার ভাবানীপুর গ্রামের একজন তথ্যদাতা বলেছেন, "আগে মানুষজন কিন্তু আমাদের চাইতে বেশি শক্তিশালী ছিল। এখন মানুষজন নানা পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার খায়। কিন্তু বর্তমানে খাবারের মধ্যে নানারকম বিষ থাকে আগের খাবারের মধ্যে কিন্তু এরকম ভেজাল ছিল না। আগে মানুষজন বসে আধাকেজি চালের ভাত খেয়ে ফেলতো। এখন মানুষজন খাবারই খেতে পারে না, পেটে এসিডিটি হয় আরও কত রকমের সমস্যা। এখন এই ভেজালযুক্ত খাবার খেয়ে কারো মাঝে আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না, যতই পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার খাক। আগের মাটির শক্তি ছিল; সার, বিষ এইসব ছাড়াই ফসল উৎপাদন হত। আর এখন সার, বিষ ছাড়া কোনো ফসল উৎপাদন হয় না। এ কারণে মানুষজন এখন আর খাবার খেয়ে গায়ে শক্তিও পায় না রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও থাকে না।"

কৃষক পরিবারগুলোর চিরায়ত মূল্যবোধগুলো বাজার কাঠামোর মাঝে কীভাবে ভিন্নমাত্রায় টিকে থাকে তার একটা ধারণা একজন গরু খামারির সাথে তার গোয়াল ঘরে দাড়িয়ে আলাপচারিতা থেকে পাওয়া যায়। তিনি তার গোয়ালের দুটি গরুকে দেখিয়ে বলেন, "এর নাম বাহাদুর, এটা অস্ট্রেলিয়ান ক্রস জাত। ভালো একটা দাম পামু বলে আশা রাখি। আর ঐ লাল দেশি গরুটা দেখতাছেন ওর নাম লালামোহন। সামনের কুরবানির হাটে দুইডারেই তুলমু।" স্বভাবতই তাকে প্রশ্ন করলাম, "দুইটা নামই কি আপনি দিছেন?" সে বলল, "নাহ, অস্ট্রেলিয়ানটার নাম আমি দিছি। এটা বড়, তাগড়া বাজারে ভাল দাম পামু তাই নাম দিছি বাহাদুর। আর দেশিটা একজন হিন্দু মহিলার কাছ থেকে কিনছি, সেই নাম রাখছে লালমোহন, খুব যত্ন কইরা নিজের ছেলের মত কইরা বড় করছে গরুডারে। তাই আমি নামটা রাইখা দিছি।" এখানে আমরা দুটি গরুই বাজারে আসতে দেখি দুটি নাম নিয়ে তবে দুটি নামের নামকরণের প্রেক্ষিত ও অনুভূতি ভিন্ন। আমরা দেখতে পাই ফসল, জমি, গবাদিপশুর সাথে কৃষকের যে আত্মিক সম্পর্ক ছিলো, সে সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন

কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার, নানা ধরনের রাসায়নিক সার, কীটনাশকের জোগান, উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ও চুক্তিসমূহে নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ চিরায়ত কৃষিভিত্তিক সম্পর্কগুলোতে একধরনের রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। পূর্বের ভূস্বামী-বর্গাচাষীর সম্পর্কগুলোতে যে সামন্তবাদী মানসিকতা ছিল তা বর্তমান সময়ে কমে এসেছে, নাই বললেই চলে। বর্তমানে বাজারনির্ভর

কৃষিকাজে নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় আবার উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে উচ্চ উৎপাদন ব্যয় মিটিয়ে জমি বর্গা নিয়ে ক্ষুদ্রচাষীরা পোষাতে পারেন না। আবার, একই সময়ে গ্রামে দেখা যায় বড় কৃষকরা কৃষি থেকে সরে এসে শহরমুখী হচ্ছে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষিত হচ্ছে এবং শহরে নানান পেশার সাথে যুক্ত হচ্ছে। ফলে জমির মালিক বড় কৃষক পরিবারগুলো গ্রামের ছোট কৃষকদের কাছে নানা ধরনের চুক্তিতে জমি দিচ্ছেন, যেমন—বন্ধক, বছরভিত্তিক চুক্তি, ইত্যাদি। গ্রামে কৃষিশ্রমিকের অপ্রতুলতাও অবস্থাসম্পন্ন জমির মালিকদের কৃষিতে অনুৎসাহী করে তুলছে। কৃষিতে যে কায়িক শ্রম দিতে হয় মানুষ এখন আর তা দিতে চায় না। আগে গৃহস্থ বাড়িতে পেটে ভাতেও মানুষ কাজ করেছে। এক পেট খেতে দিয়ে মানুষকে সারাদিন কাজ করিয়ে নিয়েছে, বর্তমান সময়ে তা ভাবা যায় না। এক্ষেত্রে সুনামগঞ্জের একজন বলেন, "এখন অন্যের জমিতে কামলা দিলে লোকে কী বলবে এই ভেবে অনেকেই কামলা খাটে না, বরং বড় গৃহস্থদের কাছ থেকে বছরভিত্তিক, বন্ধক, খায়খালাশি নানা ধরনের চুক্তিতে জমি নিয়ে নিজে চাষ করে। যাদের জমি আছে তারাও দেয়। অভাবে পড়লে জমির মালিক জমি বিক্রি করে, বন্ধক দেয়। এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে।"[৯]

আবার গ্রামে বর্তমান কৃষিকাঠামো লক্ষ্য করলে দেখা যায় গত দুই-তিন দশকে কৃষি শ্রমিক, গৃহস্থালীর কৃষি নিবিড়তা, কৃষিকাজকেন্দ্রিক কর্মযজ্ঞ তথা প্রাত্যহিকতায় পরিবর্তন এসেছে, যেমন—গ্রামগুলোতে মোটামুটি তিন দশক আগে ধনী গৃহস্থ পরিবারে 'বছরমারী কামলা' (একজন শ্রমিক যিনি সারা বছর খানা সদস্যের মত করে থাকেন) থাকত, যদিও এখন এরকম গৃহস্থ পরিবার গ্রামে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আবার, একইভাবে "মাগুন কামলা" বা বদলি কামলা দেয়া বর্তমানে দেখা যায় না বললেই চলে। কিন্তু গ্রামের মানুষদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আগে কারো কোন কাজ দ্রুত করে ফেলা দরকার কিন্তু সে হয়তো অর্থাভাবে কিংবা শ্রমিকের অভাবে কাজটা শেষ করতে পারছেন না। তখন প্রতিবেশি সকলে মিলে তার সেই কাজটি করে দিত। আর সকলে মিলে এই কাজ করে দেওয়া উপলক্ষ্যে গৃহকর্তা সকলের একবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতেন। পাশাপাশি দেখা যায়, গ্রামের অবস্থাসপন্ন ধনী গৃহস্থ পরিবারে লজিং মাস্টার থাকতো; এখন সে প্রচলনও নাই।

অন্যদিকে, বর্তমান বাজারকেন্দ্রিক কৃষি কাঠামোয় নানাপর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান (অংশীজন) কাজ করে থাকে। এরা একেকজন একেকটা বিষয়ের সাথে জড়িত, আবার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যেমন—সার, কীটনাশক ডিলারদের কাছ থেকে কৃষকরা সার, বীজ, কীটনাশক অনেক কিছু সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে অনেক সময় নগদ টাকা দিয়ে আবার অনেক সময় বাকিতেও সংগ্রহ করে থাকে। এক্ষেত্রে যাদের সাথে পরিচিতি

আছে তাদেরকেই সাধারণত বাকি দেওয়া হয়। আবার কখনো কখনো লেনদেন হতে হতেই এক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাদেরকেও বাকি দেওয়া হয়। সুনামগঞ্জের এক তথ্যদাতা এই বিষয়ে বলেন, "সম্পর্ক হল টাকার সম্পর্ক। টাকা নাই তো কেউ এসব দিবে না। কখনো কখনো যদি আত্মীয়তার (রক্ত সম্পর্ক ব্যতীতও হতে পারে) সম্পর্ক থাকে তখন হয়তো হাজার পাঁচেক টাকার মালও হাওলাতে পাওয়া যায়, তবে গ্রামের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগের মতো আন্তরিকতা নেই, এখন টাকার সম্পর্কই মূখ্য।"

কৃষিকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানে পরিবর্তন

গ্রামীণ কৃষিকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থায় কৃষি, ফসল ও ফলনের সাথে উৎসবের যোগাযোগ সহজেই বোঝা যায়। আমাদের গবেষণায় কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠানসমূহের প্রেক্ষিত থেকে পরিবর্তনের ধরন দেখতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলার পর পর্যন্ত গ্রামীণ গৃহস্থালিগুলোতে বিভিন্ন আচার ও অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিলো, যা বর্তমানে অনেকাংশেই কমে এসেছে। সুনামগঞ্জের পশ্চিম কাশিপুর গ্রামে জানা যায়, আগে কার্তিক মাসের শেষ দিনে গ্রামের কিশোররা "ভোলা খেদানোর রাত" পালন করতো, ভোলার রাতে মাঠে খড় দিয়ে বাঘ বানানো হত। সেই সাথে ঘর বানানো হত। সেই ঘর নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি যাওয়া হত। গ্রামের মানুষ তখন তাদের পিঠা, চিড়া ইত্যাদি দিতো। আর সন্ধ্যায় তারা সেই ঘর মাঠে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিত। এখন আর গ্রামের কিশোরদের মাঝে 'ভোলার রাত' পালন করতে দেখা যায় না। আবার, একজন জানান, "আগে ভোলার রাতে মানে কার্তিক মাস যাওয়ার দিন, রাতে ৫ জাতের ধান বাঁশের কূলাতে করে ঘরের চালের উপর সারারাত কুয়াশাতে রাখা হত। সকালে উঠে দেখতো, কোন কোন জাত কুয়াশাতে ভিজেছে আর কোন কোন জাত ভিজে নাই। যেই জাতগুলো ভিজতো সেগুলোর বীজ বপন করতো। এখন মানুষ বিছনই (বীজ) রাখে না। বাজার থাইকা কিনে আনে।"[১০] একই গ্রামে জানা যায় হিন্দুরা প্রথম চাষের জমি 'বাও' (চাষের জন্য জমিকে প্রস্তুত করা) করার পর "দেবতার স্থান" (নির্দিষ্ট কিছু স্থান দেবতার স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা আছে) থেকে কাদা নিয়ে কপালে দিতো। এরপর সবাই জমি চাষ করা বা ফসল রোপণ করা শুরু করতো। এখন সেখানে এর কিছুই আর সেভাবে উদযাপন করা হয় না। বীজতলা থেকে ধানের চারা জমিতে নেয়ার আগে মুসলিম কৃষকরা 'পাক' হয়ে 'মুঠ' নিতো যাকে তারা 'গুছি দেওয়া' বলতো। গুছি দেয়া হত হুজুর ডেকে মিলাদ পরে। এই দিনে কৃষকরা কিছু জিনিস মেনে চলতো। এ সময়ে তারা চাষের যন্ত্রপাতি বা ঘরের খাবার অন্যদের সাথে আদান-প্রদান করতো না। এই সময় পিঠা বানানো হত। সেই পিঠা বাচ্চা, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্যদের নিয়ে খাওয়ার পর তারা 'জালা' (ধানের চারা) ফেলা শুরু করতেন। এছাড়া আগে ধানক্ষেতে 'ক্ষিরিবাস' হত। ধান গাছ যখন গর্ভাবস্থায় আসে, যখন গাছে ধান আসা শুরু হয়, তখন পিঠা, বেল, আঁখ ইত্যাদি নিয়ে ধানক্ষেতে ভোগ দেয়া হত। ফসলকে গর্ভবতী নারী বা মায়ের সাথে তুলনা করে এটি করা হত। আগে হিন্দু-মুসলিম উভয়ে ক্ষিরিবাস দিলেও, এখন শুধু হিন্দু কিছু কৃষককে এটি পালন করতে দেখা যায়। এছাড়া "মানত গাছ"-এর পাশে "বদ্যিনাথ স্থান"-এ হিন্দু সম্প্রদায় হাওরের উদ্দেশ্যে মিষ্টান্ন ভোগ দেয়। হাওর বলতে তারা মূলত কৃষিজমিকে বুঝায়।

আবার, হাওরে আগে কৃষিকাজের "উবার" মেনে চলা হত। একেক হাওরের জন্য একেকটি উবার ছিলো। উবার বলতে মূলত কয়েকটি দিন বা বারকে বোঝায় যেসব দিন বা বারগুলোতে হাওরে কৃষিকাজ না করার এক ধরনের মান্যতা আছে। কোনো হাওরে শনিবার বা কোনো হাওরে মঙ্গলবার উবার থাকে। আগে সেদিন কোনভাবেই কেউ সেখানে কৃষিকাজ করতো না বা গুছি দিত না। তবে বর্তমানে হিন্দুরা উবার মেনে চললেও হুজুর বা 'মুন্সি'রা উবারকে 'বেদাত' বলে চিহ্নিত করায় মুসলিমরা তা মেনে চলে না। উবার মানা হত মূলত

বানে ভেসে আসা পাথর, বানের স্রোত, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে হাওর বা ফসলের মাঠকে রক্ষা করার জন্য। হাওরে উবার দেয়ার সময়ে দোহাই দেয়ার কাজ 'পিরাল' ও 'গোঁসাই'রা করতেন। পিরাল হল পীর গোত্রীয় ব্যক্তি যারা হাওর অঞ্চলে থাকেন (বাস করেন)। তাঁরা চৈত্র মাসে এসে হাওরে 'দোহাই মানতেন' যেন পাথর (শিলা বৃষ্টি) না আসে। পাশাপাশি তারা হাওর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ফসলের জন্য দোয়া করে দিয়ে যেত। পরে আবার জৈষ্ঠ্য মাসে তারা আসতেন ফসল কেমন হয়েছে দেখার জন্য। তখন কৃষকরা তাদের ধান দিয়ে দিত। বর্তমানে হাওরে আর পিরাল দেখা যায় না বা তাঁরা আসেনও না।

কৃষিভিত্তিক এই সকল আচার, অনুষ্ঠান, প্রথা কমে যাওয়ার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে যে বিষয়টা অনুধাবিত হয়, কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত নানা অনুষঙ্গ, প্রাণ-প্রকৃতি, পরিবেশের সাথে নিবিড়তা বর্তমান আধুনিক কৃষিচর্চা নানা প্রেক্ষিত থেকে সীমিত করে দিয়েছে। এই চর্চাগুলো কৃষি সংস্কৃতির অংশ থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে আর তার থাকে যন্ত্রনির্ভর বাণিজ্যিক মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে গ্রামীণ কৃষি মনন।

অবসরহীন দিনকাল

গত কয়েক দশকে গ্রামীণ জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে মানুষের কাজ, অবসর সময় ও অবসরযাপনের ক্ষেত্রে। আগে মানুষ কাজ করতো, কাজের পর অবসর নিত; বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিকাজের বাইরে আয়মূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগের অপ্রতুলতা ছিল। কৃষিতে স্বল্পমেয়াদি নতুন নতুন ফসল এসেছে, সেচ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রযুক্তির ব্যবহার, খামারভিত্তিক গবাদি পশু পালন, মাছ চাষ ইত্যাদির প্রভাবে কৃষিতে এখন সারা বছরই কর্মব্যস্ততা থাকে। এর পাশাপাশি গত দুই-তিন দশকে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, কৃষি কাজের বাইরের আয়মূলক কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের চাহিদার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন এসেছে জীবনমান পরিবর্তনের ধারণাতেও। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বর্তমানে মানুষের অবসর সময়ও কমেছে। প্রযুক্তি, নগর কিংবা বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ততা, আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ততা, জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, ভোগ প্রবণতাসহ নানান বিষয় মানুষের চাহিদা পাল্টিয়ে দিয়েছে। আমাদের গবেষণাতথ্য দেখায় যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মূল্যবোধে মানুষের ভোগপ্রবণতায় যে পরিবর্তন এসেছে তা ব্যয় বৃদ্ধি করেছে, ফলে মানুষ নানাআয়মূলক কাজের সাথে নিজেকে জড়িত করছে। নিজের স্বাভাবিক কাজের পর মানুষ এখন অন্য কিছু করতে চায় এবং এর ফলে কমে আসছে তার অবসর সময়। অবসরযাপনের জন্য বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন উপায় ছিল। কাশিপুরে বয়স্করা ঘাটায় (পুকুর ঘাট) মাচা বানিয়ে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন সেখানে বসে গল্প করতেন, দাবা (হুক্কা) টানতেন, হুক্কার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিড়ি টানতেন। ভবানীপুরে বয়স্ক পুরুষরা একসাথে রাস্তার পাশে বসে গল্প করতেন, ফসলের ব্যাপারে কথা বলতেন। মহিলারা বাড়ির উঠানে বসে গল্প করতেন। যুবক ও তরুণ যারা কাজ করতো তারা কাজের পর দোকানে বসে চা খেতে খেতে গল্প করতো। মহিলারা বাড়ির উঠানে সারাদিনের কাজের পর পাটি বিছিয়ে বসতো, সেখানেই আশেপাশের বাড়ির মহিলারা আসতো, গল্প করতো, বাচ্চাদের সেখানেই ঘুম পারিয়ে

পরে ঘরে নিয়ে যেত। আবার বয়স্করা নাতিপুতিদের সাথে গল্প করে সময় কাটাতেন কিন্তু বর্তমানে সেরকম অবসর যাপনের পরিসর কমে এসেছে। বাচ্চারা সাধারণত স্কুল থেকে ফিরে পরদিন স্কুলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অবসর সময় কাটাতো। কিন্তু বর্তমানে পড়াশোনার ব্যাপারে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বাচ্চাদের স্কুল বা মাদ্রাসায় পড়ানোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাচ্চারা এখন আর আগের মত অবসর সময় পায় না। মহিলাদের ঘরের কাজ করা নিয়ে ব্যস্ততা প্রযুক্তির প্রভাবে আগের চেয়ে অনেকাংশেই কমে এসেছে। কিন্তু বাচ্চাদের পড়াশোনা করানো, কিংবা অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণভাবে মহিলাদেরও অবসর সময় আগের চেয়ে কমে গিয়েছে। সামগ্রিকভাবে আমাদের গ্রামগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষের এখন আয়মূলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা বেড়েছে এবং সাথে সাথে তাদের অবসর সময়ের পরিমাণও দিনদিন কমছে।

বিনোদনের সাথে অবসর সময়ের নিবিড় সম্পর্ক আমরা আমাদের গবেষণায় দেখতে পাই। আগে অবসর সময় বেশি থাকায় অবসর কাটানোর উপায় হিসেবে যে বিনোদনগুলো ছিলো তা অনেক বেশি সামষ্টিক ছিল। অবসর সময়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করতো, গান, কিচ্ছা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে বিনোদনের আয়োজন করা হত। বিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে মাঠ, বড় গাছের ছায়া, বাড়ির উঠান বেশি ব্যবহৃত হত। বাচ্চারা তাদের চারপাশের বিভিন্ন জিনিস দিয়েই নিজেদের খেলার উপকরণ তৈরি করে নিত এবং তা দিয়েই খেলতো। কিন্তু বর্তমানে অবসরযাপনের নানাবিধ পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। সামগ্রিকভাবে অবসরযাপনে এখন অনেক বেশি প্রযুক্তি (মোবাইল, টিভি, ডিশ চ্যানেল, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদি) নির্ভরতা আমরা দেখতে পাই। আগে অবসরে নকশিকাঁথা সেলাই করা, বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন গৃহস্থালি পণ্য তৈরি করা এবং সেই সময় গল্প করা অবসরযাপনের সবচেয়ে সাধারণ উপায় ছিলো। তাছাড়া সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে আড্ডা ও রাতে গান বা কিচ্ছার আসর বসানো অবসর বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিলো। এখন অবসর যাপন ও বিনোদনের বড় একটি জায়গা দখল করে নিয়েছে প্রযুক্তি, বিশেষত মোবাইল ফোন। বাচ্চারা এখন বিকেলে মাঠে খেলার চাইতে মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেম খেলায় বেশি ব্যস্ত থাকে। অবসরযাপনের একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে টেলিভিশন। ডিশ সংযোগের বদৌলতে টিভি চ্যানেলের সংখ্যা বেড়েছে এবং মানুষ এখন বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে নিজেদের অবসর সময় কাটায়। বয়স্করা আগের মত বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা দিলেও তাদের আড্ডার বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এসেছে। এছাড়া গ্রামের চায়ের দোকানগুলোতে এখন চায়ের পাশাপাশি টিভি থাকে যাতে খেলা বা সিনেমা চলতে থাকে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এখন কয়েক বাড়ির মহিলারা একসাথে হয়ে আড্ডা দেয়ার চিত্র খুব একটা দেখা যায় না।

গ্রামীণ খেলাধুলাতে পরিবর্তন

গ্রামে মানুষের সাথে আলাপের সময় খেলাধুলা গ্রামীণ বিনোদনের একটা বড় দিক হিসাবে সামনে আসে। আগে সামাজিকভাবে নানা ধরনের গ্রামীণ খেলাধুলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। এর মাঝে

উল্লেখযোগ্য হিসেবে দেখা যায় জাতীয় খেলা হাডুডুসহ দাড়িয়াবান্ধা, নৌকা বাইচ, সাঁতার, ইত্যাদি। বর্তমানে খেলাধুলার স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন কমে এসেছে। তবে, এক্ষেত্রে ফুটবল খেলাটি স্থানীয় খেলা না হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয়ভাবে এর জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটও জনপ্রিয় খেলা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মিডিয়ানির্ভর ক্রিড়াভিত্তিক বিনোদন বাজার স্থানীয় মননে প্রভাব রাখছে বলে অনুধাবিত হয়েছে।

দেখা যায়, গ্রামীণ চিরায়ত খেলাগুলো বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের খেলতে দেখা যায়না। আগে শিশুরা নিজেরা চার পাশের অনুষঙ্গকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের খেলনা নিজেরাই বানিয়ে ফেলতো কিন্তু এখন নানান ধরনের প্লাস্টিকের খেলনা গ্রামে শিশুদের হাতে দেখতে পাওয়া যায়। ফলে, স্থানীয় পরিবেশের সাথে নিবিড়ভাবে বেড়ে উঠার যে শৈশব সে প্রেক্ষিতে পরিবর্তন এসেছে। এই বিষয়ে জামালপুরের রামপুরা গ্রামের একজন বর্ণনা করেন,

> “আমরা আমাদের শৈশবে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করেছি। বর্তমানে গ্রামীণ খেলাগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে। নতুন প্রজন্মের কাছে এগুলো এখন শুধুই গল্প। এই খেলাগুলো হলো দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বৌচি, লাঠিবাড়ি, গুটিখেলা, চড়ুইভাতি (ডোগামালি), এক্কাদোক্কা, ঘুড়ি উড়ানো, এলাটিং-বেলাটিং, ওপেন্টি বায়োস্কোপ, হাডুডু, নৌকাবাইচ, কানামাছি, একে ঋতু, টুনটুনি পাখি, রশি খেলা, বালিশ খেলা, লুডু, বরফ-পানি, কুতকুত ইত্যাদি। এই খেলাগুলো আজকাল খুবই কম চোখে পড়ে। কালের বিবর্তনে এখন ক্রিকেট, ফুটবল, র‍্যাকেট ইত্যাদি বেশি চোখে পড়ে।[১১]

গ্রামের মানুষ মনে করে বর্তমানে খেলার ধরনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এখন স্কুলের যে অনুষ্ঠানগুলো হয় সেখানে খেলাধুলাগুলো হয়ে থাকে। সেখানে এখন দৌড় খেলা, লং জাম্প, হাই জাম্প এসব হয়। এখন আর আগের গ্রামীণ খেলাগুলো দেখা যায় না। বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন বিজয় দিবস কিংবা স্বাধীনতা দিবসগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রিড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আগে যে খেলাগুলো গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রতিদিনের খেলা ছিলো এখন সেগুলো বছরে ২-৩ দিন হয়তো বাচ্চারা খেলে থাকে।

আবার, খেলাধুলার উপকরণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা যায়। শিশুরা মাটির পুতুল বানিয়ে, সেটা দিয়ে খেলতো। এখন কেনা পুতুল দিয়ে ছোট বাচ্চারা খেলে। আগের মত বাচ্চাদের দলবেঁধে খেলতে কম দেখা যায়। শিশুরা বাজার থেকে কেনা খেলনা দিয়ে অনেকটাই একা একা খেলে কিংবা মোবাইলে ভিডিওগেম খেলে। গ্রামের মানুষদের অনেকেই মনে করে বাজার থেকে কেনা দামী খেলনাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এইভেবে শিশুরা অনেকক্ষেত্রেই নিজের খেলনা অন্যের হাতে দিতে চায় না। আগে খেলনা নষ্ট করলেও কেউ কিছু বলে নাই, কিন্তু এখন খেলনা নষ্ট করলে মা বাবার কাছে বকা খাওয়ার ভয় থাকে। কয়েক দশক আগেও শিশুরা হাতে পুতুল বানিয়ে তা দিয়ে খেলা করতো তাই ভেঙ্গে গেলেও সমস্যা ছিল না, আবার বানায় নিত কিন্তু এখন টাকা দিয়ে খেলনা কিনে আনতে হয় বাজার থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় দেখা যায় বাজারে

নতুন নতুন খেলনা আসার সাথে সাথে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। দেখা যায় শহরের বাচ্চারা যে খেলনাগুলো দিয়ে খেলা করে সেই ধরনের খেলনার চাহিদা গ্রামীণ সমাজে তৈরি হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সুনামগঞ্জের একজন তথ্যদাতার বর্ণনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠে,

> আমাদের এখানে চৈত্রমাসটা থাকে মেলার মাস। আমাদের অত্র এলাকায় প্রত্যেকটা গ্রামে মেলা হবে। আগে মেলায় একশো টাকা দিয়ে খেলনা কেনার কারো সাধ্য ছিলো না। তখন মাটির পুতুল, এরকম কুমারের তৈরি জিনিস থাকতো। তখন দুই টাকা, পাঁচ টাকা দিয়ে মাটির খেলনাটাই কিনতে হতো। আর এখন মাটিরগুলো কিনে না, এখন সব প্লাস্টিকের গুলো চলে। আমি আমার বাচ্চাকে মেলায় নিয়ে যাই, যদি মাটির দোকানে নিয়ে যাই তাহলে কিনবে না, আর প্লাস্টিকের দোকানে নিয়ে গেলে বলে বাবা এটা দাও, এটা দাও। আবার এখনকার আবার শুধু প্লাস্টিকের খেলনা পছন্দ করে না। এখন চায় রিমোট সংযুক্ত, প্রযুক্তি সংযুক্ত খেলনা। আরো অত্যাধুনিক খেলনা চায়।[১২]

ফলে তার কথা থেকে বুঝতে পারি যে, সময়ের সাথে সাথে বাচ্চাদের রুচি ও চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। আর এই চাহিদা তৈরি করার পিছনে বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে আরো জানা যায়, বর্তমানে খেলাধুলাও আগের মত আর হয় না। মোবাইল আসার পরে ছেলে মেয়েরা সবাই মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। এখন শারীরিক কসরতের খেলার স্থানে ছেলেমেয়েরা মোবাইলে খেলাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। দেখা যায় ছেলেরা একসাথে জড়ো হয়ে মোবাইলে নানা ধরনের গেইম খেলে থাকে যেমন—লুডু, পাবজি, ফ্রি ফায়ার ইত্যাদি। তাদের একজন জানান, "পোলাপান ফুটবল, ক্রিকেট মোবাইলে খেলে। আবার মোবাইলের খেলাত বাজি ধরে। জুয়া খেলে গোপনে।"[১৩] তাছাড়া গ্রামের মধ্যে খেলার মাঠ কমে গেছে, গ্রামের স্কুলগুলোর মাঠও ছোট হয়ে গেছে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে। ফলে খেলাধুলার পরিসরের ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন দেখা যায়।

অপরদিকে, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে যুবক বা মাঝবয়সীরাও বিনোদনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করতেন। জানা যায়, আগে মানুষজন শুধুমাত্র কৃষি কাজ করেছে। মানুষের হাতে এই কাজের বাইরে সময় ছিল। কিন্তু এখন মানুষ অনেক রকমের কাজ করছে। অবসরে খেলার চেয়ে যদি ওই সময় কাজ করে তাহলে কিছু টাকা আয় হবে এই জন্য মানুষজন এখন খেলাধুলা ছেড়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে একজন বলেন, "মাঝাবয়সী লোক যারা ছিল তাদের জন্য তেমন কোনো খেলাধুলা ছিল না। তবে কিছু খেলা মৌসুমি হাডুডু খেলতো অনেকে, নৌকা বাইচ খেলতো, মাঝে মাঝে খেলা হতো লাঙ্গল টানা এগুলো অনেক খেলতো। তাছাড়া ওই সময় তাস খেলতো লোকজন, ফুটবল খেলা হতো। তবে আগে সবাই তাস খেলতো না যারা একটু খারাপ তারা তাস খেলতো এবং সেটা হতো টাকা দিয়ে খেলা। গ্রামের লোকজন এরকমভাবে বিচার করতো যে যারা তাস খেলে তারা খারাপ আর যারা খেলে না তারা ভালো।"[১৪] ফলে দেখা যায় যে, একজন

তার বিনোদন বা অবসর যাপনের জন্য কী ধরনের খেলা খেলছে তার উপর তার ব্যক্তিত্ব বাকিরা বিচার করতো। আর মোবাইলে জুয়া খেলে থাকে অনেকে যা সহজে সমাজের চোখে ধরা পরে না।

মোবাইলের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামের অভিভাবকরা তাদের কিশোর বয়সী ছেলে মেয়েদের এক সাথে খেলতে দেয় না, কেননা তারা মনে করে এখনকার সময়ের বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে মোবাইল দেখে দেখে নানা বিষয়ের সাথে পরিচিত হয়ে উঠছে, বিশেষ করে তারা পর্নোগ্রাফি কিংবা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভিডিও দেখে অনেক বিষয়ে উৎসুক হয়ে উঠছে আগের তুলোনায়। ফলে দেখা যায়, আগে নানা ধরনের গ্রামীণ খেলা ছেলেমেয়েরা সকলে একসাথে খেলত, কিন্তু এখন তা দেখা যায় না। গ্রামের মানুষ ভাবে একসাথে খেললে হয়তো তাদের মধ্যে 'অন্য' সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, যেহেতু ছেলেমেয়েরা এখন ফোন দেখে অনেক কিছু সম্পর্কে আগে থেকেই জানে, ফলে অভিভাবকেরা ভয় পায় তাদের একসাথে খেলতে দিতে। তাছাড়া আগে মেয়েরাও গোল্লাছুট, কানামাছি, বউচি খেলছে। এখন মেয়েরা আর কোন খেলা খেলে না। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে নারীর পর্দা নিয়ে ইসলামিক নানান বয়ানে মানুষকে প্রভাবিত হতে লক্ষ্য করা যায়। কুমিল্লার একজন তথ্যদাতা বলেন, "বর্তমানে নারীদের খেলাধুলা নাই। যারা ঐ শহরকেন্দ্রিক আছে তারার কিছু আছে। নারীরা আগে গোল্লাছুট মোল্লাছুট এইডা সেইডা খেলতো, এডিও ২০০০ এর পরে থেইকা কমা শুরু করছে।"[১৫]

সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

মাঠ গবেষণার তথ্য আমাদের সামনে গত কয়েক দশকে গ্রাম বাংলায় বড় ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের নজির হাজির করে। গ্রামের চিরায়ত সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোতে ছিলো—বিভিন্ন ধরনের গানের আসর, কিচ্ছার আসর, যাত্রা, নাটক, পালা গান, নৌকা বিলাস, ব্যাঙের বিয়ে, নৌকা বাইচ, বিভিন্ন মেলা ইত্যাদি। তার সাথে গ্রামের স্কুলগুলোতে আয়োজন করা বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা; বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন ভাষা দিবস (শহীদ দিবস), স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদিও গ্রামীণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসবের অনুষঙ্গ।

কিন্তু গত দুই দশকে এসব অনুষ্ঠানের বেশ পরিবর্তন আমরা গ্রামগুলোতে দেখতে পাই। গ্রামগুলোতে আগে গ্রামের মধ্যেই রিহার্সেল (অনুশীলন) করে যাত্রা বা নাটক আয়োজন করার চল ছিলো। পাশাপাশি বাইরে থেকেও যাত্রা বা নাটকের দল ভাড়া করে এনে নাটক বা যাত্রার আয়োজন করা হত। সেসব অনুষ্ঠানে দর্শকও হত অনেক। ঘাটুগানের সময় ছেলে বাচ্চাকে মেয়ে সাজিয়ে গানের সাথে নাচানো হত। তবে যাত্রাপালায় মেয়ে পার্টের অভিনয় করার জন্য অনেক সময় যাত্রার দলগুলো তাদের সাথে মেয়ে নিয়ে আসতো। গ্রামের নিজস্ব আয়োজনের যাত্রা বা নাটকে সাধারণত ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করতো। গানের বা কিচ্ছার আসর ছিল প্রচলিত চর্চা। গ্রামবাসীরা নিজেরাই গান গাইতো, গান বাঁধতো। বিভিন্ন ধরনের গানের প্রচলন

ছিলো তখন। আমাদের গবেষণাতথ্যে আমরা জারি গান, সারি গান, পুঁথিপাঠ, ধামাইল গান, বাউল গান, ঘাটুগান, পালাগান, মুর্শিদিগান, উরিগান, বৈঠকিগান, হুলিগান, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি গানের নাম জানতে পারি। এর মধ্যে কাশিপুরে এখনও বিয়ের সময় ধামাইল গান গাওয়া হয়। ঘাটুগানের কিছু দল এখনো আছে যারা 'বায়না' পেলে তবেই গ্রামে আসে। অন্যান্য গানের আসরগুলো কিংবা আনন্দের জন্য গানের আসর বসানো এখন কমে গিয়েছে, কিংবা কিছুক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলেই আমরা জানতে পারি। তেমনিভাবে কিচ্ছার আসরও আগে বেশ জনপ্রিয় ছিলো। খায়রুন সুন্দরী বা অন্যান্য কিচ্ছার আসর মানুষের জন্য উৎসবের সমান ছিলো। সাধারণত নিজেদের বাড়ির উঠানে এই আসরগুলো বসতো এবং নিজেরাই কিচ্ছা পড়ে শোনাতো। মাঝে মাঝে বাইরে থেকেও লোক এনে এমন আসর বসানো হত। নিজেদের গ্রামের বাইরে অন্য কোথাও এমন আয়োজন হলে সবাই সেখানে যেয়ে অংশগ্রহণ করতো। এ বিষয়ে হাওরের একজন বলেন, "যাত্রাপালার জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে, এখন যাদের বয়স চল্লিশোর্ধ্ব তারা তরুণ বয়সে রোজ স্বন্ধ্যায় যাত্রাপালা দেখতে যেতেন। নিজ হাটি/পাড়া বা গ্রামে যদি কোনো রাতে যাত্রাপালা না হত তবে তারা প্রয়োজনে সাঁতার কেটে অন্য গ্রামেও যাত্রাপালা দেখতে যেতেন; সেইক্ষেত্রে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত কিছুকেই তারা পরোয়া করতেন না।"[১৬] এছাড়াও গান ও কিচ্ছা গাওয়া গ্রামীণ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। ধানের কাজ করতে, অবসরে বসে থাকতে থাকতে তারা গান বা কিচ্ছা গাইতো। কিন্তু পরবর্তীতে ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন, মানুষের আয়মূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ততার ফলে অবসরের ঘাটতি ইত্যাদির প্রভাবে এই ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রামীণ সমাজ থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে গ্রামগুলোর উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো নানা ধরনের মেলা। এই মেলাগুলোও ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

এর বাইরে ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে মূলত ঈদ, পূজা-পার্বণ, শবে বরাত ইত্যাদি অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক আচার, প্রথা ইত্যাদিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন শবে বরাত, শবে কদর, শবে মেরাজের বিভিন্ন ধরনের উদযাপনের কথা গ্রামবাসীরা বলেন। কাশিপুরে শবে বরাতের রাতে লোকজন উৎসব করে নামাজ পড়তো। রামপুরায় শবে বরাতের রাতে লোকজন সারারাত মসজিদে থাকতো। এছাড়াও শবে বরাত, শবে মেরাজ ও শবে কদরে লোকজন ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতো, কবরস্থানে যেয়ে কবর যিয়ারাত করতো, মসজিদে খিচুড়ি, শিরনি ইত্যাদির আয়োজন করতো ও বেশি বেশি দান খয়রাত করতো। কিন্তু বর্তমানে তা কমে গিয়েছে। এছাড়া মহররমে, কারবালা ও হাসান-হোসেনের স্মরণে কাশিপুরে মাটি বা কাগজ দিয়ে ঘোড়া বানানো হত। এই উপলক্ষ্যে আশেপাশের গ্রামেও দাওয়াত দেয়া হত। তারপর সেই ঘোড়া কবরস্থানে নিয়ে যেয়ে 'জিল' বা 'সারপিন' গাছের নিচে রেখে জারি গাওয়া হত। মহিলারা একপাশে আর পুরুষেরা আরেকপাশে দাঁড়িয়ে জারি গাইতো। এছাড়া আগে গ্রামগুলোতে মিলাদ পড়ার প্রচলন ছিলো, কিন্তু এখন আর মিলাদ পড়া হয় না। এসবের বেশিরভাগই এখন হয় না কারণ মুসলিম ধর্মীয় গুরু বা হুজুর/মুন্সিরা বলেন যে, এসব বেদাত (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যেগুলো করেননি, পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম পালনের জন্য যে নিয়মগুলো এসেছে)। রমজান উপলক্ষ্যে আগে রামপুরায় চাঁদ ওঠার পর থেকে প্রায় ১৫ দিন রুটি বানানো হত এবং তা লোকজনদের মাঝে বিলানো হত। এখন তেমনটা আর দেখা যায় না। হিন্দুধর্মে যেমন কীর্তনের আয়োজন বেড়েছে, তেমনিভাবে ইসলাম ধর্মে ওয়াজ মাহফিল আয়োজনের সংখ্যাও বেড়েছে।

আগে কয়েক গ্রাম মিলিয়ে একটা ওয়াজ হত কিংবা এক গ্রামে একটাই ওয়াজ হত। তবে এখন প্রায় প্রত্যেক মসজিদ থেকেই ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

পারিবারিক কাঠামোর বদল

পরিবারের গঠনে যে পরিবর্তন এসেছে তা অনেকটাই দৃশ্যমান। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর যৌথ পরিবারগুলো ক্রমশই একক পরিবারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে দৃশ্যমান পরিবারের গঠনে পরিবর্তন ব্যতিত জ্ঞাতিসম্পর্কের নিবিড়তা, যুথবদ্ধতা, পারস্পারিক দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়েও পরিবর্তন এসেছে। যেখানে দেখা যায় বাংলাদেশি গ্রামীণ সমাজে চিরায়ত যুথবদ্ধতায় ক্ষয় ধরেছে। মানুষের মাঝে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রবণতা প্রকটতর হচ্ছে। যদিও বর্তমান নয়াউদারনৈতিক (নিওলিবারেল) অর্থনৈতিক বাস্তবতা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকেই উৎসাহিত করে। আর এই বাস্তবতায় সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও মননের এমন পরিবর্তন অর্থবোধকতা লাভ করে। এখানে উদাহরণ হিসাবে মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহের কৃষিনির্ভরতা থেকে নানাবিধ পেশার সাথে যুক্ত হওয়া, গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়া, সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা, শিক্ষার প্রসার, সামগ্রিকভাবে জীবনে অর্থনৈতিক দিক থেকে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের নিরন্তর প্রচেষ্টাকে বিবেচনায় নেওয়া যায়। আবার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে টিকে থাকার প্রয়োজনেই পারিবারিক গঠনের এই পরিবর্তনকে মানিয়ে নিতে হয় টিকে থাকার কৌশল হিসাবে।

গ্রামের কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে একক পরিবার তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা পারিবারিক মূল্যবোধের জায়গায় পরিবর্তনকে বুঝতে সহায়তা করে, পূর্বে গ্রামগুলোতে তিন বা চার প্রজন্ম একসাথে একই ঘরে বা বাড়িতে বা খানায় বসবাস করা খুব স্বাভাবিক ছিল। এসব পরিবারে দাদা থেকে নাতি এবং তার ছেলেমেয়ে, কিংবা বাবা তার সকল পুত্র ও পুত্রবধুরা এবং তাদের সকলের সন্তানরা একসাথে থাকতো। কিন্তু তা ভেঙ্গে এখন শুধুমাত্র বাবা ও তার অবিবাহিত ছেলেমেয়ে একসাথে থাকার প্রবণতা বেড়েছে। এ বিষয়ে হাওর অঞ্চলের স্থানীয় একজন তার অনুধাবন ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন:

> “আগে দাদা-দাদী বেঁচে থাকলে মানুষ আলাদা হইতে চাইতো না, ভাতিজারাও আলাদা হয় নাই আর এখন তো বাপ থাকতে না থাকতেই ঝি-পুত আলাদা হয়ে যায়। তারা বলে আমাদের পরিবার আমাদের। এখন ছেলেরা তাদের মা-বাবাকে বলে যে তোমরা আমাদের পালন করেছো বড় করেছো। এখন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে পালন করবো, বড় করবো। আর আগে এরকম বলে নাই। আগে বাচ্চাকাচ্চাকে বলেছে যে আগে আমরা মা-বাবাকে পাইলা লই। এখন আর যৌথ পরিবার নেই। দাদারা একসাথে থাকে না, চাচা একসাথে থাকেনা, এখন মনে করেন বাপের ঘরে যে ভাই গুলো হচ্ছে তারাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে।”[১৭]

পারিবারিক তথা জ্ঞাতিসম্পর্কের যে সংযুক্ততা, যুথবদ্ধতা, আবেগ, অনুভূতিগত দিক থেকে বিবেচনা করলে গ্রামের মানুষের স্বরে এক ধরনের হারানোর তথা বিরহের সুর শুনতে পাওয়া যায়।

আবার, একই সাথে সমসাময়িক নয়াউদারনৈতিক বিশ্বায়ন ও বাজার ব্যবস্থার বাস্তবতায় পরিবারের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় নিলে, আমরা গবেষিত গ্রামগুলোতে পরিবারের গঠন পরিবর্তনের প্রবণতায় ৩টি ধারা দেখতে পাই—১) যেসব পরিবার এখনও কৃষিভিত্তিক গৃহস্থ পরিবার সেসব পরিবারে বিয়ের কয়েক মাস পর ছেলে ও পুত্রবধুকে আলাদা করে দেওয়া বা আলাদা করে রান্না করে খেতে দেখা যায়। ২) অভিবাসী সদস্য থাকা পরিবারগুলোতে অভিবাসী ছেলের স্ত্রী তাদের সন্তানদের নিয়ে আলাদা খানা গঠন করে। এসব ক্ষেত্রে তারা সাধারণত শহরে থাকতেই বেশি আগ্রহী হয়। ৩) অন্যদিকে যেসব পরিবারে সন্তানদের শিক্ষিত করা হয় এবং তারা চাকরিসূত্রে শহরে বাস করে, তারা সাধারণত বিয়ের পর তাদের স্ত্রীকে সাথে করে শহরে নিয়ে যায় এবং সেখানেই পরিবার গঠন করে। এই ৩টি ধারার মাঝে তৃতীয়টিকে স্বাভাবিক ব্যাপার হিসাবে বিবেচনা করার সাবলীলতা সমাজে দেখা গেলেও বাকি দুটির ক্ষেত্রে 'আলাদা হওয়া' ব্যাপারটি নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মিশ্রতা পাওয়া যায়, বিশেষত নারীকে একক পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে দায়ী করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তবে সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ সমাজে একক পরিবার গঠন করাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে একজন উত্তরদাতা তার অনুধাবন জানান এভাবে—"পৃথক তো অটোমেটিক, মানুষ তো বাড়তেই আছে, জাগা (জায়গা) লাগবে তো। আগে তো মানুষের প্রাইভেট টাকা এত একটা ছিল না, যার জন্য পৃথকেরও অবস্থান খুব কম ছিল। এখন তো যার যার টাকা পয়সা হয়ে গেছে, দিনদিন টাকা পয়সা হইতেছে। আর গৃহস্থী ফ্যামিলির ভিতরে পোলা বিয়া করায় পনেরো/ষোল/আঠারো বছর বয়সে, দেখা যায় যে, বিয়া করাইয়া ছয় মাস বা এক বছর লাস্টিং করে তহন পোলারে ভিন্ন (আলাদা) কইরা দেয়, নে তোরডা তুই কইরা খা। গৃহস্থী ছোটাখাটো ফ্যামিলির ভিতর এইডি বাড়ছে অনেক। আবার যারা নাকি একটু এডুকেশন ফ্যামিলি আছে তারা হয়তো লেখাপড়া করছে, বাপ বিয়াশাদি করাইছে, অটোমেটিক বউ নিয়া শহরে চইলা গেছে, এটা বলতে হয় না কাউকে কখনো বলতে হয় নাই, তাদেরকে ভিন্ন করতে হয় নাই। তাদের ছেলেপেলেরা শহরে লেখাপড়া করবে এই একটা উছিলা। যে আমাদের গেরামে পোলাপাইন লেহাপড়া করাইতে পারতাম না, আমরার অসুবিধা হয়, শহরে চইলা গেলাম। ঐ পয়সা ইনকামের লগে লগে এইডা বাড়ছে।"[১৮]

গ্রামের সচ্ছল মধ্যবিত্ত কিংবা প্রবাসী পরিবারগুলোর মাঝে শহরে পরিবার গঠন করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়াশোনা করানোকে কারণ হিসেবে সামনে আনতে দেখা যায়। অন্যদিকে গ্রামের ভেতরে 'আলাদা হওয়া'র ক্ষেত্রে পরিবারের আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই পরিবার আলাদা হওয়ার জন্য পুত্রবধুকেই দোষারোপ করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কুমিল্লার ভবানীপুর গ্রামের একজন প্রবাসীর মা বলেন,

> “এহন কারোরে কাউরে মানতে চায় না। কয় আমার স্বামী কামাই করে, আমার অধিকার, তোমার কি অধিকার? এইডাতো আইজ ১০-১৫ বছর ধইরাই তো দেখতেয়াছি। যার যার স্বাধীনতা চায়, শ্বাশুড়ির সাথে থাকলে তো হেই স্বাধীনতাডা দেহইতে পারে না। যেমন আমার পুতে ১৫০,০০০ টাকা বেতন পায়, আমার বউ দেখছে এত ফ্যামিলিরে খাওয়াইয়া হেই বাড়ি কিছু করতে পারত না, তই হেই লাইগা হে জামাইরে কবজাইয়া সরাইছে। যে আমরার ফ্যামিলিরে দিলে আমার ভবিষ্যৎ কিতা, তই আমার পুতের বউ হেনো (শহরে) ১৫-২০ লাখ টাকার জাগা কিনছে, সইরা না গেলে কিনতারতো না, শ্বশুরশ্বাশুড়িরে এত খাওয়াইতে গেলে কিনতারতো না এরকুম।[১৯]

সাধারণভাবে বলা হয় যে, পুত্রবধুরা তাদের মত করে স্বাধীনভাবে শ্বশুর-শাশুড়ির প্রভাবের বাইরে গিয়ে সংসার করতে চায়। তাই তারা স্বামীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনকেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ মনে হয়েছে।

পারিবারিক পরিসরে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন

পরিবারের ছোট শিশু বা বাচ্চাদের লালন পালন করার মানসিকতা ও চর্চায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে বাচ্চাদের লালন পালন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে মায়েরা প্রথাগত পদ্ধতি ও বয়স্কদের মতামতই অনুসরণ করতো। তবে বর্তমানে মায়েরা বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ও হাইজিনের ব্যাপারে অধিক সচেতন। বাচ্চাদের এখন যতটা সম্ভব সাবধানতার সাথে বড় করা হয়। ফলে বাচ্চা লালনপালনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন উপকরণ ও বাচ্চাদের জন্য নতুন খাবার গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশে পরিণত হচ্ছে। এছাড়াও বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন উপকরণের ব্যাপারে মায়েরা টিভি বা মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারে এবং নিজের বাচ্চার জন্য তা নেওয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ৩-৪ দশক পূর্বে গ্রামীণ গৃহস্থ পরিবারগুলোতে বাচ্চারা পরিবারের বয়স্কদের কাছে বড় হত। ফলে দাদী বা নানীদের সাথে বাচ্চাদের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ

হওয়ার সুযোগ ছিল এবং দাদা-দাদী বা নানা-নানীদের সাথে বাচ্চাদের সম্পর্ক খুব গাঢ় হত। এখন ছোট পরিবারগুলোতে বাচ্চারা মায়ের কাছেই বড় হয়। যৌথ পরিবারগুলোতেও বাচ্চা লালন পালনে মায়েরাই বেশি সময় দেয়। ফলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিশুদের ঘনিষ্ঠতা আগের থেকে কমে এসেছে আর সম্পর্কের নিবিড়তার দিকে থেকেও দুর্বল হয়ে আসছে।

আবার, পূর্বে পরিবারগুলোতে মেয়ে সন্তানের তুলনায় ছেলে সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হত। সাধারণভাবে তখন ধারণা করা হত যে, মেয়েদের বিয়ে দিলে তারা পরের বাড়িতে (শ্বশুরবাড়ি) চলে যাবে। তাই তাদের শিক্ষা বা অন্যান্য ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হত না। ছেলে ভবিষ্যতে পরিবার ও বাবা মায়ের দ্বায়িত্ব নিবে ভেবে ছেলেদের আলাদা গুরুত্ব দিয়ে বড় করা হত। বর্তমানে বাবা-মায়ের সেই মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। ছেলে সন্তানের পাশাপাশি মেয়ে সন্তানকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বড় করার পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে।

বর্তমানে সম্পত্তি ভাগাভাগি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারগুলোতে "বড়-ছোট" ক্ষমতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেমন আগে বড় ভাই কোনো সিদ্ধান্ত নিলে বাকি ভাইয়েরা তা কোনোরূপ প্রতিবাদ বা মতামত ছাড়াই মেনে নিতো, তবে বর্তমানে তা অনেক ক্ষেত্রেই কমে আসছে। আগে কে কীভাবে চলছে বা চলতে পারছে কিনা, কার কী সমস্যা হচ্ছে সে বিষয়ে একে অপরের খেয়াল রাখতো, এখন আর আগের মতো একে অপরের খেয়াল রাখে না যদিওবা যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি নানাভাবে তাদের সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিষয়ে পশ্চিম কাশিপুরের একজন বলেন, "আগে পরিবারের মধ্যে ভাই বোনের আদর, মায়া-মহব্বত-ভালোবাসা বেশি ছিল, আর এখন একটু আদর সোহাগ কম। এখন হেরা কীভাবে চলবে হ্যারারটা হেরাই। আর আগে মনে করেন, আমার একটা ভাই চলতে পারছে না, আমার একটা বোন চলতে পারছে না তখন চালিয়ে দিয়েছে। বা আত্মীয়-স্বজন চলতে পারছে না তাকেও সহযোগিতা করেছে। এখন এটা খুবই কম।"[২০]

অন্যদিকে, রামপুরার ক্ষেত্রে দেখা যায় নদীভাঙ্গনের ফলে পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসতি করায় তাদের মধ্যে দুরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে সামগ্রিকভাবে, গ্রামে গোষ্ঠিকেন্দ্রিক সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা গবেষণাতথ্যে উঠে এসেছে। বর্তমানে গোষ্ঠিগুলোর ক্ষমতা বা প্রভাব তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। গোষ্ঠির লোকজনের মধ্য আগেরমত সম্পর্কের জোর দেখা যায়না। এমনকি চাচাত ভাইরাও তাদের নিজেদের মধ্যকার বিভিন্ন সমস্যা (বিশেষত জমাজমি ভাগাভাগি কেন্দ্রিক) নিয়ে নিজেদের মত করে ব্যস্ত থাকে। তবে ভবানীপুরে আমরা গোষ্ঠিকেন্দ্রিক সম্পর্কের প্রভাব দেখতে পাই। যেমন—খন্দকার বাড়ি তাদের গোষ্ঠির সদস্যদের নিয়েই গঠিত। তারা নিজেদের মত থাকে এবং নিজেদের গোষ্ঠিকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান তারা নিজেরাই করে। ফলে তাদের বাড়ির কোনো ব্যাপারে গ্রামের অন্য লোকজনকে দরবার বা সালিশ করতে দেয় না। তবে সাধারণভাবে পরিবার ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্য যোগাযোগ ও সম্পর্কের পরিবর্তন দেখা গেলেও বেশিরভাগ গ্রামবাসী মনে করে তাদের উপর তাদের আত্মীয়দের 'হক' বা অধিকার আছে।

গ্রামীণ নারীর জীবনে পরিবর্তন

নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

গত তিন দশকে গ্রামীণ নারীদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যেমন—নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়েছে, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বেড়েছে, নারীদের নিজের প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাওয়ার হার বেড়েছে যেখানে আগে শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্য বাইরে যেত বলে অধিকাংশ গ্রাম থেকে মোটা দাগে জানা যায়। তাছাড়া, পারিবারিক পর্যায়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামত দেয়ার এবং তা গ্রহণের প্রবণতা বেড়েছে পরিবারগুলোতে। এক্ষেত্রে কক্সবাজারের নয়াপাড়া গ্রামের প্রেক্ষিত থেকে একজন তথ্যদাতা বলেন:

> “ আগে মেয়েরা বাড়ির বাইরে বের হতেন না, কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে বাড়ির পুরুষরা তাদেরকে সেগুলো এনে দিতেন। এমনকি একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর মেয়েদেরকে স্কুলে যেতে দিতেন না। বাড়ির মহিলারা সূর্য উঠার আগে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে বাড়ি থেকে বের হয়ে পানি নিয়ে আসতেন। কোথাও বেড়াতে যেতে হলেও মহিলারা রাতের বেলা যেতেন। বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ আসলে মহিলারা বাড়ির ভিতরে চলে যেতেন। মহিলারা বাড়ি থেকে বের হয়ে কোন ধরনের আয়মূলক কাজ করতেন না। তবে বাড়ির ভিতরে সেলাই কাজ সহ বিভিন্ন ধরনের হাঁস-মুরগী পালন করে আয় করতেন। পুরুষ মহিলা একসাথে কাজ করাকে এলাকায় আগে খারাপ হিসেবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু বর্তমানে এলাকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। মেয়েরা এখন নিজের ইচ্ছা মত পড়াশোনা করতে পারে, চাকরি করতে পারে। পুরুষ মহিলা একসাথে কাজ করাকে আগের মত খারাপ ভাবে নেয় না। এখন মহিলারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাজার থেকে নিজেরা কিনে আনে। দিনের যে কোন সময় মেয়েরা বের হতে পারেন। বলতে গেলে এখন সব জায়গায় মেয়েদের পাওয়া যায়।[২১]

কিন্তু এই পরিবর্তনগুলোকে সবাই একইভাবে গ্রহণ করে না। কেউ কেউ ইতিবাচকভাবে দেখলেও অনেকেই একে নেতিবাচকভাবে দেখে থাকে, যেমন—জামালপুরের একজন তথ্যদাতা বলেন: “কিছু কিছু নারী বাইরে বের হয়ে তাদের আচার ব্যবহার খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা সভ্যতার মতো তারা আচরণ করছে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এখন নারীদের চলাফেরা খুবই খারাপ দিকে যাচ্ছে। বলতে গেলে বেহায়াপনা সৃষ্টি হচ্ছে তবে এটা সবার ক্ষেত্রে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে।”[২২] আর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পেছনে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে বলে স্থানীয়রা প্রচলিতভাবে মনে করে। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে একজন তথ্যদাতা বলেন: “আগে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি বেশি ছিল, এখন মানুষ সেখান থেকে বের হয়ে আসছে। এখন মানুষ শিক্ষার প্রতি অনেক সচেতন। তারা মনে করে মেয়ে শিক্ষিত না হলে তার বাচ্চারা ভালো পড়াশোনা করতে পারবে না। পাশাপাশি মানুষ এইটাও চিন্তা করে যে, পড়াশোনা না করলে স্বামীর অধীন হয়ে থাকতে হবে। আগে এলাকায় টিভি ছিল না, মোবাইল ছিল না। এখন টিভি এবং মোবাইল সবার হাতে হাতে হয়ে

গেছে। ফলে মেয়েরা ভারতীয় বিভিন্ন সিরিয়াল দেখে নিজেদের পরিবর্তন করতেছে। ঈদের সময় সিরিয়াল দেখে সেগুলোর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে নিজেরা কাপড় কিনে। মেহমান আসলে অনেক ধরনের নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করে। সাজগোজের সময়ও তারা ভারতীয় সিরিয়াল অনুসরণ করে।"[২৩] এছাড়াও এখন গ্রাম থেকে অনেকে পড়াশুনা করতে বা বিভিন্ন কাজে গ্রামের বাইরে শহরে যায়। ফলে শহুরে সংস্কৃতির একটা প্রভাব তাদের জীবনযাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি নানা ধরনের প্রযুক্তি নারীদের জীবনকে আগের চেয়ে সহজ করেছে। আগে যেখানে মাটির ঘর লেপতে হতো, মাটির চুলায় রান্না করতে হতো, ধান বাড়িতে আসলে ধানের কাজ করতে হতো, এখন প্রায় প্রতিটা কাজের জন্য প্রযুক্তি রয়েছে। যেমন, সুনামগঞ্জের পশ্চিম কাশিপুর গ্রামের একজন বলেন, "সুনামগঞ্জে আগে তো প্রচুর মাছ ধরা পড়তো, কেউ বিক্রি করতো না আর ফ্রিজও আসে নাই যে সংরক্ষণ করে রাখবে। তো তখন শুটকি দেয়া হত সেসব মাছ। এই পুরো কাজটিই নারীরা করতো। পুরুষরা বাঁশ দ্বারা চাটাইয়ের মত মাচা করে দিত আর নারীরা বিভিন্ন জাতের মাছ বেছে শুটকি দিতো। কোন শুটকি শুকালো, কোনটা শুকালো না সেসব তদারকি করতো।"[২৪] গ্রামে ৩-৪ মাস অবস্থান করে জানা যায়, ফ্রিজ আসার কারণে এখন নারীরা আর শুটকি রাখে না, আর রাখলেও তা পরিবারের জন্য করে অল্প করে। নিজেদের জন্য কাঁচা মাছ ফ্রিজে রেখে বাকিগুলো বিক্রি করে দেয়। ফলে এসব গৃহস্থালি প্রযুক্তির কারণে নারীদের অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা উদ্যোক্তা হিসেবে নানা ধরনের কাজ শুরু করতে পারছে। যেমন—সেলাই মেশিন কিনে নিজের এবং অন্যদের কাপড় সেলাই করছে। আবার উদ্যোক্তা হওয়ার নানা ধরন ও কৌশলও তারা ডিজিটালাইজেশনের ফলে টিভি, মোবাইল, ইউটিউব থেকে পেয়ে থাকে। এছাড়াও নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রেও এক ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। কক্সবাজারের নয়াপাড়া গ্রামের একজন তথ্যদাতা বলেন: "আগে বোরকার প্রচলন ছিলনা। পর্দা করার জন্য মহিলারা ছাতা হাতে নিয়ে চলাফেরা করত। এখন সবকিছুই পাওয়া যায়, এখন বোরকা একজনের কাছেই আছে ৭/৮ টা।"[২৫] পাশাপাশি, বসতবাড়ির ভৌতকাঠামোর পরিবর্তনের কারণে নারীদের জীবনে অবসরযাপন, পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তন এসেছে। এখানে মাঠ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে একটা উদাহরণ বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, গ্রামবাসীদের সাথে আলাপকালে যে বিষয়টা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা হলো মানুষ বাড়তেছে বড় বড় বাড়ি ভিটাগুলো ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ হচ্ছে, কক্সবাজারের নয়াপাড়া গ্রামে দেখা যায় মানুষদের মাঝে নিজেদের বাড়িগুলো প্রাচীর দিয়ে আলাদা আলাদা করে নিজেদের সীমানা নির্ধারণ করার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে নারীরা আগে যেভাবে একে অপরের বাড়িতে অবাধে যাতায়াত করতে পারতো, নিজেদের মধ্যে নানান আলাপচারিতা হতো অবসর সময়ে, এখন সেভাবে যাতায়াত করা যায় না বলে অভিমত প্রকাশ করেন অনেক নারী। তারা আরো মনে করেন, বাড়ির সীমানা দেয়ালগুলো একজনের বাড়িতে ঢুকতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংকোচ তৈরি করে নিজের মধ্যে, কেননা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে এখন সচেতন। দুই তিন দশক আগেও গ্রামীণ বাড়ি-ঘরের ভৌত অবকাঠামো এমন ছিল না। অনেক খোলামেলা ছিল একে অপরে বাড়িতে যাতায়াত ছিল নিঃসংকোচে, যা প্রকারান্তরে অবসর সময় যাপনের ধরনের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। একদিকে প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে একটি

স্থান বা স্পেস তথা ল্যান্ডস্কেপকে ঐ স্থানে মানুষের উপস্থিতি ও কার্যকলাপকে অগ্রাহ্য করে একটি নিরপেক্ষ পটভূমি হিসেবে দেখা হয়; আর অন্যদিকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে প্রতিটি স্থানকে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানগত (কগনিটিভ) বা প্রতীকী (সিম্বলিক) বিন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Ingold, T., 1993)।

নারীর পারিবারিক ও সামজিক জীবনে পরিবর্তন

পরিবারের সিদ্ধান্ত আগে একচেটিয়াভাবে পুরুষরা নিয়ে থাকলেও এখন পরিবারের নানা সিদ্ধান্তে নারীরাও তাদের মতামত দিয়ে থাকে। নারীর কথা মতো কাজ করা নিয়ে সমাজে যে নেতিবাচকতা তা নিয়ে সুনামগঞ্জের একজন বলেন, "আগে পরামর্শ করতো না নারীদের সাথে। আগে পুরুষেরা কিছু জিজ্ঞাস করলে তারে মাইগ্যা বলতো। লজ্জাজনক মনে করত। এখন সবাই মিলেই করে।"[২৬] এখন অনেকক্ষেত্রেই নারীরা সিদ্ধান্ত নেয়, সম্পত্তি, সংসারের সব খোঁজ খবর তাকেই রাখতে হয় যেমন—ছেলেমেয়ের শিক্ষা, পরিবারের সবার স্বাস্থ্য ইত্যাদি। বিশেষ করে যখন তাদের স্বামী প্রবাসী, সেক্ষেত্রে পরিবারের নানা সিদ্ধান্ত নারীকেই নিতে হয়। তবে এখানেও অনেকক্ষেত্রে পারিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলাপ করে সিদ্ধন্ত নিতে হয়। প্রবাসী অনেক পরিবারে নারীই পরিবারের প্রধানের ভূমিকা পালন করেন। প্রবাস থেকেও তার কাছেই টাকা পাঠানো হয়, যদি সেই পরিবারে কোনো পুরুষ গুরুজন না থাকে। আবার অনেক পরিবারে নারীরা খানা প্রধানের ভূমিকা পালন করেন সেখানে পুরুষ গুরুজন থাকলেও নারীর কাছে আলাদা করে টাকা পাঠানো হয়। তবে আগের চেয়ে এখন নারী-পুরুষ একসাথে আলোচনা করে পরিবারের নানা সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়।

আবার গ্রামে আগে দেখা যেতো সবাই ছেলে শিশু কামনা করতো, মেয়ে শিশু কেউ চাইতো না কিন্তু এখন পুরোপুরি না বদলালেও এই চিন্তা-ভাবনা কিছুটা বদলেছে, মেয়েদেরও এখন মূল্যায়ন করছে। এর পেছনের কারণ হিসেবে একজন জানান—"মেয়েরাও তো এখন ইনকাম করছে। দেখা যায় দরিদ্র পরিবারগুলোতে মেয়ে থাকলে এখন দুই মেয়েকে ঢাকায় বাসা বাড়িতে দিয়ে দিলে প্রতি মাসে পাঁচ পাঁচ করে দশ হাজার টাকা পাঠাবে।"[২৭] আবার নারীরা হাঁস মুরগী পালন করে, সেলাই করে পরিবারের জন্য বাড়তি আয় করে থাকে। আর এই টাকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংসারের কাজে ব্যয় করে থাকে। আবার গ্রামে যে আগে "বউ পেটানোর" একটা প্রচলন ছিল এখন সেগুলো অনেকাংশেই কমে এসেছে। আবার হিন্দু মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার না থাকলেও মুসলিম মেয়েদের থাকে। আগে পরিবারগুলোতে নারীদের সম্পত্তি দেয়ার ব্যাপারে উদাসীনতা থাকতো কিংবা অনেকক্ষেত্রেই মেয়েরা ভাইদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কথা চিন্তা করে বাবার সম্পত্তির শক্ত দাবিদার হত না এখন অনেকেই নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এই সম্পত্তির শক্ত দাবিদার হয়ে উঠে।

এছাড়াও আগে ছেলে-মেয়ে এক সাথে খেললে কেউ কিছু মনে করতো না, কিন্তু এখন একসাথে খেলে না। হাওরাঞ্চলের একজন তথ্যদাতা তার পর্যবেক্ষণে বলেন: "আগে হাটিবাড়ির মধ্যে ছেলে-মেয়ে একসাথে খেলেছে। মুরুব্বিরা কইতো এই তোর ভাই, এই তোর বোন, সাবধান। আগে ছেলেমেয়ে রাতের রাত পোহায়ে ফেলেছি এক ঘরে। কেউ কিছু বলতো না। কারণ ভিতরে তো কিছু নাই। আর এখন একটা ঘরে

যদি ৩ বার যায় তাহলে মনে করে যে রহস্য আছে। এখন বিশ্বাসের মাঝে ঘাতক দিয়ে ফালাই। এই যে এখন আইছে মোবাইল। সিনেমাতে দেখে এগুলো শেখে।"[২৮] এমনকি নিজেদের খালাতো, মামাতো, চাচাতো ভাই-বোনের একসাথে মেলামেশাও পছন্দ করে না। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রাত্যহিক আচার-আচরণে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

নারীর কর্মপরিধিতে পরিবর্তন

গ্রামে নারীদের আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা ও প্রেক্ষাপট দুই প্রেক্ষিতেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেমন আগে বেশিরভাগ দরিদ্র নারীরা বড় গৃহস্থ বাড়িতে কৃষিমৌসুমগুলোতে ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করতো কিংবা গ্রামের ভেতরেই ধনী গৃহস্থ বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতো। তবে বর্তমান সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গ্রামীণ নারীদের শহরের শ্রম বাজারের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিত থেকে দেখা যায়, গ্রামের অনেক মেয়েরা এখন শহরে গার্মেন্টসে কাজের জন্য কিংবা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য শহরে চলে আসে। অনেকে ভিন্ন দেশেও অভিবাসন করে থাকেন। সুনামগঞ্জের একজন বলে, "ঢাকা, ভোলাগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে যায় নারীরা। ছোটছোট মেয়েরা ঢাকার গৃহকর্মী হিসেবে কাজে গেছে। বেশি টাকা পেয়েছে এতে। এছাড়াও আছে গার্মেন্টস। এখন আর কেউ শরমের কথা ভাবে না। আগে ভাবতো। আগেও অভাব ছিল, মানুষ শরম ভেঙে কাজ করতে চেয়েছে। কিন্তু সুযোগ ছিল না। এখন কাজের সুযোগ হয়েছে তাই মানুষ শরমকে আর গুরুত্ব দেয় না।"[২৯] এছাড়াও নারীদের বিভিন্ন এনজিওদের সাথে কাজ করতে দেখা যায়, চাকরির হারও বেড়েছে। আগে যেখানে এনজিওতে চাকরি করাকে গ্রামে নেতিবাচক হিসেবে দেখা হতো।

নারীদের মাঝে নিজেকে স্বাবলম্বী করার মানসিকতা ও পরিবারকে আর্থিকভাবে সমর্থন দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এ বিষয়ে একজন নারী বলেন, "আমি স্বামী পরিত্যাক্তা, আমার স্বামী নাই কিন্তু আমি তো আমার সন্তানের গার্জিয়ান। সন্তানকে বড় করার জন্য আমার তো কিছু না কিছু করা লাগবে।"[৩০] গ্রামগুলোতে এখন প্রবাসী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারী অভিবাসনে প্রেক্ষিত বর্ণনা করে হাওরের গ্রামটির একজন বাসিন্দা বলেন, "৪-৫ বছর হলো বিদেশ আবার যাওয়া শুরু করেছে। মহিলাও গেছে ভালোই, আমাদের গ্রামে প্রায় ১৫ জন হবে, মহিলারা যারা গেছে তারা ভালো করেছে। সাধারণত নিম্নবিত্ত মহিলারাই যায়; সৌদি, দুবাই এসব দেশে যায়। মহিলাদের যেতে টাকা লাগে না। যারা তাদেরকে নেয় তারাই দুইটা মোবাইল দেয়। একটা মহিলার পরিবারকে দেয় আরেকটা মহিলার কাছে থাকে যাতে তারা যোগাযোগ করতে পারে, যাওয়ার খরচাপাতিও তারাই দেয়।"[৩১] তাছাড়াও নারীরা নিজের গ্রামের বাইরেও নানা সময় কাজ করতে যায়। আর গার্মেন্টসের কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামের নারীরা একজন কাজ করছে, আয় করছে, পরিবারকে সাহায্য করছে, তাকে দেখে বাকিরাও অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আশির দশকে ইয়েনেকা আরেন্স ও ইওস ফান ব্যুরদেন (১৯৮০) কুষ্টিয়ার ঝগড়াপুর গ্রামের উপর এথনোগ্রাফিক কাজে দেখান যে, পর্দাপ্রথার

কারণে নারীরা বাড়ির বাহিরে কিংবা গ্রামের বাহিরে যাওয়ার পরিসর ছিল সংকোচিত। তারা দেখান যে, ঐ গ্রামের বেশিরভাগ বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে বাবার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া কিংবা ডাক্তার দেখানোর কাজেই সাধারণত গ্রামের বাহিরে যেতে পারতো। কিন্তু, আমরা যদি আরেন্স ও ব্যুরদেনের ঝগড়াপুর গ্রামের নারীর মবিলিটির প্রেক্ষাপট থেকে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে নারীর মবিলিটির দিকে তাকাই তবে বিস্তর পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি।

গ্রামীণ জীবনে প্রাত্যহিকতার অনুষঙ্গে পরিবর্তন

গ্রামের মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে ভোগ সংস্কৃতির পরিবর্তন বা বাজারের সাথে সম্পৃক্ততার প্রেক্ষিতে পরিবর্তন। গ্রামের মানুষের ভোগ সংক্রান্ত আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এক ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং ব্যক্তি পর্যায়ের ভোগের পরিবর্তন দেখতে পাই। যার ফলস্বরূপ মানুষের বাড়ি, আসবাবপত্র, তৈজসপত্রে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি তাদের রূপচর্চার সামগ্রী, দোকানের পণ্য ইত্যাদিতেও পরিবর্তন এসেছে। যার পিছনে মানুষের আয়, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি, বিজ্ঞাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অভিবাসন ইত্যাদি নিয়ামকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে অনুধাবিত হয়।

গ্রামের মানুষদের সাথে বিভিন্ন সময়ে তাদের স্মৃতিচারণমূলক আলাপচারিতা ও মাঠ পর্যবেক্ষণের আলোকে আমরা দেখতে পাই, ঘর-বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে যেমন চাহিদার পরিবর্তন এসেছে তেমনই পরিবর্তন এসেছে আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, গৃহস্থালি উপকরণ, গৃহসজ্জাসহ নানা বিষয়ে। যেমন—গ্রামীণ মানুষদের মতে, আগে মোটাদাগে আসবাবপত্র বলতে চৌকি আর টেবিলকেই বুঝানো হত। এছাড়া মোড়া ছিল, বসার জন্য পিড়ি-পাটি ছিল, টিনের ট্রাংক ছিল। আর যাদের একটু সহায় সম্বল ছিল তাদের কাঠের চেয়ার, জলচৌকি, ধান রাখার জন্য মাচা, মাটির কলস, কুড় (মাটির কলস আকৃতির বেশ বড় পাত্র) ছিল সেগুলোতে ধানের বীজ সংরক্ষণ করা হতো। ঘরের ভিতর মাচা করে ওখানে তৈজসপত্র, মশলা, পোশাক এগুলো রাখা হতো। তখন ব্যাংক ছিল না, টাকা পয়সা সব পাতিলের মধ্যেই রাখতো আবার মানুষ আগে মাটির ব্যংকে টাকা জমাতো। আর যেগুলোকে মানুষজন একটু গুরুত্বপূর্ণ মনে করত সেগুলো ট্রাঙ্কের মধ্যে, বিছানার নিচে রাখতো। কাঁচের জিনসপত্র (তৈজসপত্র) ছিল গ্রামের সামর্থ্যবানদের বাড়িতে।

আর এখন তো আসবাবপত্রের শেষ নাই। বর্তমানে, একটা বাড়িতে খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, ওয়ারড্রব, স্টিলের আলনা, প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল, শোকেইস, সোফাসেট, ফ্রিজ নানান কিছু থাকে। জানালায় পর্দা ব্যবহার করছে, কাঠের পাল্লা জানালার স্থানে থাই গ্লাস ব্যবহার করছে। আগে মাটির জিনিসের ব্যবহার বেশি ছিল। এখন সবকিছুই সিসা (অ্যালুমিনিয়াম) আর প্লাস্টিকের তৈরি। মানুষজন ঘরের মধ্যে বিভিন্ন রকম লাইট দিয়ে সাজায়। কুপির স্থানে চার্জের টর্চ এসেছে। বৈদ্যুতিক ফ্যানের পাশাপাশি সোলার ফ্যান আছে। আবার বর্তমানে এসএস পাইপের (স্টেইনলেস স্টিল) ফার্নিচারের দিকে গ্রামের মানুষ ঝুঁকেছে, আগে গ্রামের মেয়েদেরকে বিয়ের সময় সিন্দুক/ট্রাঙ্ক দিতো, আর এখন আলমারিসহ আরও নানা ধরনের ফার্নিচার দেয়। যেমন—খাট, শোকেস, চেয়ার, আলনা, গ্যাসের চুলা, রাইস কুকার অর্থাৎ একটা সংসার

নতুন করে সাজানোর জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছু দিতে হয়।

তৈজসপত্রের পরিবর্তনের বিষয়ে একজন তথ্যদাতা বলেন: "আগের মানুষের চাহিদা ছিলো কম। এখনকার মানুষের চাহিদা বেশি। আগে মাটির থালাবাসন ব্যবহার করতো। আর এখন আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্টিলের জিনিস ব্যবহার করে। আবার মুসলিম সমাজে মেলামাইন, সিরামিকের জিনিস ব্যবহার করে। আগে মানুষ মাটির জিনিস কম পয়সায় কিনতে পারতো। এখন তাদের ওগুলো ভালো লাগে না। এখন নেয়, সিরামিকের প্লেট, মেলামাইনের প্লেট।"[৩২] সামগ্রিকভাবে গ্রামে এখন প্লাস্টিকের ব্যবহার বেশি দেখা যায়, যা আগে ছিল না। এখন প্লাস্টিকের চেয়ার সবার বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়, আগের ধনীদের বাড়িতে চেয়ার দেখা যেত। প্লাস্টিকের ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে গ্রামবাসীদের যুক্তি হলো এগুলো ওজনে হালকা, দেখতে ভালো, নাড়াচাড়া করতে সুবিধা, দামে সস্তা, নষ্ট হয় না, পরিবর্তনযোগ্য। এছাড়াও নানান ব্র্যান্ডের প্লাস্টিকের আসবাবপত্র, বালতি, জগ এখন গ্রামের বাজারগুলোতে পাওয়া যায়, আর শহর থেকে বিভিন্ন কোম্পানির ডিলারদের গাড়ি এসে এই বাজারগুলোতে 'সাপ্লাই' দিয়ে যায়। এই আলোচনা একভাবে গ্রামের সাথে নগরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বাজারের বিস্তৃতিকে সামনে নিয়ে আসে, একই সাথে গ্রামের অর্থনীতির বিস্তার তথা মানুষের হাতে অর্থ আসার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে।

অপরদিকে, দেখতে পাওয়া যায় বিগত দশকগুলোর তুলনায় গ্রামীণ মানুষ তার ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছে (বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছেন), যেমন—দশক তিন-চার আগেও গ্রামের বাচ্চারা ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতনা, বই হাতে করে নিয়ে যেত স্কুলে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বই নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ফ্যাশনেবল ব্যাগ পাওয়া যায়, ঐগুলো নিয়ে বাচ্চারা স্কুলে যায়। পড়ালেখার বিভিন্ন সরঞ্জাম বের হয়েছে। এখন ছোট ছোট বাচ্চাদের বাবা মায়েরা পুষ্টিকর খাবার (বাজারের শিশুখাদ্য), নুডুলস খাওয়াচ্ছে, ভালো ভালো বিস্কুট খাচ্ছে, বাচ্চাদের জন্য এখন আলাদা করে জিনিস কিনে রাখে বাবা মা। বাচ্চাদের সুন্দর সুন্দর পোশাক, জুতা, নানান প্রসাধনী ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। এ বিষয়ে রামপুরা গ্রামের একজন বলেন, "যেমন আমার ছেলে যদি একবার মুখ দিয়ে বের করে যে আব্বু আমাকে এই প্যান্ট কিনে দিতে হবে তাহলে তাকে কিনে দিতে হবে নতুবা স্কুলে যাবে না। তারপর বলবে সাইকেল কিনে দিতে হবে না হলে স্কুলে যাব না। খেতে বসে বলবে মাছ খাব না মাংস কিনে দিতে হবে। এগুলো আরেকজনের দেখাদেখি যতটা তার চাইতে বাবা-মায়ের শখ আহলাদ বেশি।"[৩৩] এখানে মানুষের সামর্থ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে শখ আহ্লাদের মাত্রার যে একটা সম্পর্ক রয়েছে তার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস ফুটে উঠে।

মানুষের চাহিদা বাড়ছে ফলে গ্রামের ভেতরই দোকান গড়ে উঠেছে আর এসব গ্রামীণ দোকানে ছোটখাটো ঔষধ যেমন প্যারাসিটামল বা ব্যাথানাশক ওষুধ, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা, মনোহারী সব ধরনের পণ্য পাওয়া যায় বলে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে অথবা হাটবার না হলে মানুষ বাজারে যায় না। মজার ব্যাপার হলো এই ছোট দোকানগুলোর বেশিরভাগই দোকানির বাড়ির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মহিলারা দোকানে বসে জিনিস বিক্রি করে থাকেন। আবার অনেক সময় বাড়ির স্বামী-স্ত্রী মিলে দোকান পরিচালনা করেন। গ্রামের ভেতরের দোকানগুলোতে নারীদের সাবলীল চলাফেরা

লক্ষ্য করা যায়, এই দোকানগুলোর বড় ক্রেতা হলো নারী ও শিশুরা। আবার একইসাথে এই প্রেক্ষিতে নয়াউদারনৈতিক বৈশ্বিক বাজারের একটা প্রভাব এখন স্থানীয় বাজারের উপর লক্ষ্য করা যায়, অনেক জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক নানা কোম্পানির পন্য গ্রামীণ জীবনের অংশে পরিণত হচ্ছে। যেমন- গ্রামগুলো বিদ্যুতায়নের পর গ্রামে ফ্রিজ এসেছে আর দোকানগুলোতে কোকাকোলা, পেপসি থেকে শুরু করে দেশিয় নানা কোম্পানির পানীয় পাওয়া যায়। গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ আসার পর মানুষের গৃহস্থালিগুলোতে আধুনিক গৃহস্থালি অনুষঙ্গ ব্যবহারের ঝোঁক বেড়েছে। আবার একই সাথে নয়াউদারনৈতিক বৈশ্বিক বাজারের ভোক্তা তৈরির বিজ্ঞাপন মেশিনের বিস্তার বেড়েছে, একভাবে গ্রামীণ ছোট দোকানটি বৈশ্বিক বাজারের অংশ হয়ে উঠে, এখন টিভিতে (বিজ্ঞাপন) দেখেও মানুষ অনেক জিনিস দোকানির কাছে চায়। টিভির (বিজ্ঞাপনের) জন্যও বাজারে অনেক নতুন জিনিস আসে। যেমন—প্যাকেটের শ্যাম্পু, সাবান, প্রসাধনী, নানান রেসিপির প্যাকেটের মসলার ব্যবহার সহ ব্লেন্ডার, রাইস কুকার নানান কিছুর চাহিদা বেড়েছে।

এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামে ডিস এবং ইন্টারনেটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে আবার একে কেন্দ্র করে গ্রামের অনেকের এখন নতুন আয়ের উৎস তৈরি হয়েছে। আগে বাজারের কিছু দোকানে ইন্টারনেট ছিল, তবে বর্তমানে অনেক বাড়িতেই অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা গ্রামের মানুষ নিয়ে থাকে। এই বিষয়ে একজন ডিসের ব্যবসায়ী বলেন, "ডিসের চাহিদা কিছু মানুষের মধ্যে এখনো আছে, তারা হলো আপনার একটু মধ্যবয়স্ক থেকে বয়স্ক যারা তারা এখনো ডিস দেখে। তারা তো এই ইন্টারনেট আর স্মার্ট ফোন চালাইতে পারে না, আর মোবাইলের লেখা পড়তেও কষ্ট হয়। এই তো গতকালকে একজন আইসা এলিডি টিভি নিয়া গেছে ওনার বাপের জন্যে, খবর দেখার জন্যে। যদিও এইটা অন্য গ্রামের, কিন্তু এই ব্যাপারগুলা সব গ্রামেই এক রকম। তারপরে ধরেন ডিসের বিল দিতে হয় মাসে ২৫০ টাকা আর ইন্টারনেট এর বিল ৬০০ টাকা। আপনার পরিবারে যদি মানুষ কম থাকে অথবা ইয়াং ছেলেমেয়ে না থাকে তাহলে দেখা যায় ওই ঘরে আপনার ইন্টারনেট থাকে না, ওই ঘরে ডিস থাকে। বিলটা একটা ব্যাপার, আবার সবাই তো এখনো ইন্টারনেট ভালো করে বুঝে না, তবে আস্তে আস্তে ঠিকই বুইঝা যাইবো।"[৩৪] ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে বিশেষ করে করোনার সময় মানুষ যখন গৃহবন্দী হয়ে যায় তখন ইন্টারনেটের সেবা মানুষজন বেশি গ্রহণ করা শুরু করে। যেসব পরিবারের সদস্য বিদেশে আছে তাদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের চাহিদাটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

আবার অপর দিকে, একজন উত্তরদাতা বলেন: "গ্রামে আগে রূপচর্চার বিষয়টা কম ছিল। গ্রামের নারীরা আয়নাই হাতে নেয়নি। আয়না হাতে নিলে মানুষে মন্দ বলেছে। আগে গ্রামে এতো বাহারী প্রসাধনী ছিল না। আগে শুধু তিব্বত স্নো ছিল। আর এখন বারো মাসই ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী, পন্ডস ব্যবহার করে। গ্রামে আগে ফেসওয়াশ ছিল না, এগুলো শহরের মানুষ ব্যবহার করেছে। এখন গ্রামে অনেকেই ফেসওয়াশ ব্যবহার করে। এখন মেয়েরা-মহিলারা বাজারে যায়, মহিলারা বাজার থেকে দেখে নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করে, কিছু কিছু গ্রামের বিউটি পার্লার দেখতে পাওয়া যায়। তার মানে গ্রামের মানুষের মধ্যে এখন নানামুখী পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। গ্রামের মানুষ টিভি দেখে, যে কোম্পানির বিজ্ঞাপনটা বেশি দেখে সেই কোম্পানির জিনিসই এসে দোকানে খুঁজে। এসে বলে অমুক কোম্পানির মাল দাও। আগে তো টিভিও ঘরে ঘরে ছিল

না, এখন টিভি ঘরে ঘরে আছে। আবার মোবাইল আছে, ইন্টারনেট আছে এসবের মধ্যে দেখে। আবার মোবাইলে অর্ডার দিয়ে ফেলে কাপড়-চোপড়ের, মোবাইলে টাকা পাঠিয়ে দেয়, জিনিসপত্র এসে পড়ে। আবার মেয়েরা বাইরে থাকে, হাইস্কুলে উঠে বাইরে যায় বাজারঘাটে এগুলো দেখে। নারীরা এখন ঘরের বাইরে যায় ফলে সামাজিকতা বজায় রেখে চলতে হবে এ কারণে এখন এইসব ব্যবহার অনেক বেড়েছে।"

এই পরিবর্তনের কারণ হিসেবে গ্রামের মানুষ একজনের থেকে কিছু দেখলে তা নিজেও কিনতে চায়। মানুষ একে অপরের দ্বারা প্রবাহিত হয় যেমনটা স্বপন আদনান (২০২২) দেখান—মিডিয়ার মাধ্যমে নানা কিছুর সাথে পরিচিত হচ্ছে আর আধুনিকতার নামে জীবনাচরণ আর রুচিতে পরিবর্তন আসছে। শহরের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে নতুন নতুন পণ্যের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। যেমন—ছেলেদের মোটর সাইকেলের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। তাছাড়া এখন টিভি, মোবাইলে মানুষজন নতুন নতুন জিনিস দেখছে, এসব দেখে নতুন করে তারা আসবাবপত্র বানাচ্ছে অথবা কিনছে। তাছাড়া মানুষের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষ প্রবাসে যাচ্ছে, নানা রকম পেশায় যুক্ত হচ্ছে। অভিবাসনও মানুষের ভোগ সংস্কৃতি পরিবর্তনের পিছনে অন্যতম প্রভাবক। কারণ, এর ফলে মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। আবার বিদেশ থেকে অনেক পণ্যেরও অভিবাসন হয়, যেমন- সুগন্ধি, সাবান, চকলেট, শ্যাম্পু ইত্যাদি, যেগুলো গ্রামের মানুষরা ব্যবহার করছে ও এগুলোতে এখন অনেকাংশেই অভ্যস্থ হয়ে উঠছেন।

গ্রামীণ জীবনে প্রত্যাশার বা স্বপ্নের পরিবর্তন

গবেষণাকালীন সময়ে গবেষকদল গ্রামগুলো চষে বেরানোর সময় তাদের সেই সময়ের অনুধাবন থেকে জানা যায়, নিজের জীবন, জীবনযাপন, ও চারপাশ নিয়ে মানুষের স্বপ্ন, প্রত্যাশা বা ইচ্ছা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। আর মানুষের যোগাযোগের বিস্তার, বিভিন্ন আয়মূলক ক্ষেত্রের সাথে সংযোগ তৈরি হওয়া, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সম্পর্কের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, মিডিয়া প্রভৃতি মানুষের মাঝে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার ঘটায় যার ভেতর দিয়ে তার অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলো সে উপলব্ধি করতে পারে আর তার সাথে সাথে নতুন নতুন প্রেরণা, প্রত্যাশা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩০-৪০ বছরের দীর্ঘ সময়ে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মাঝে প্রত্যাশার পরিবর্তন এসেছে। আমাদের মাঠ গবেষণায় গ্রামীণ মানুষের প্রত্যাশার পরিবর্তনের কয়েকটি জায়গা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। গ্রামীণ জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে মানুষের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের ক্ষেত্রে।

যেমন—আগে মানুষ সন্তানদের পড়াশোনা করানোর ব্যাপারে সেভাবে আগ্রহী ছিলো না। আগে দেখা যেত যেসব পরিবারে পড়াশোনা করা কেউ আছেন কিংবা সম্পদশালী পরিবারগুলোতে বাচ্চাদের পড়াশোনা করানোর চল ছিলো। আবার তখন শুধুমাত্র ছেলেদেরই পড়াশোনা করানো হত। মেয়েদের সাধারণত আরবী আর ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হত। পরবর্তীতে মেয়েদের পড়াশোনা করানো শুরু হলেও, মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম ছিলো। গ্রামে ম্যাট্রিক পাশ (বর্তমান মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষার সমমান) করাকে বেশ বড় করে দেখা হত এবং মানুষ তাদের দেখতে যাওয়ার চলও ছিলো। আর যাদের পড়াশোনা করানোর সক্ষমতা ছিলোনা, তারা মনে করতেন বাচ্চাদের পড়াশোনা করানোর চেয়ে তাদের কাজে দিয়ে দিলে তারা আয় করতে পারবে যা

তাদের পরিবারের ব্যয় মেটাতে বেশি সাহায্য করবে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যাও বেশ কম ছিলো। পড়াশোনা করার জন্য অনেকটুকু দূরে যেতে হত।

গত প্রায় তিন দশক সময়কালে আমরা দেখতে পাই, গ্রামে শিশুদের পড়াশোনা করানোর প্রবণতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং গত দশ থেকে পনেরো বছরে তা বেশ জোরদার হয়েছে। শুরুতে গ্রামগুলোতে পর্যাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। আস্তে আস্তে সরকারি উদ্যোগ এবং বিভিন্ন এনজিওর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাদান শুরু হয়। আমাদের গবেষণাকালীন সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, গ্রামগুলোতে সরকারি প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি কিন্ডারগার্টেনের প্রচলন শুরু হয়েছে। এছাড়াও গ্রামগুলোতে মাদ্রাসার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। অভিভাবকরা বাচ্চাদের নিজেদের ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছেন। গ্রামের আশেপাশে উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ তৈরি হওয়ায় পড়ার জন্য এখন বেশি দূর যেতে হয় না এবং উচ্চশিক্ষার পরিমাণও ধীরে ধীরে বাড়ছে। আবার অনেকে মনে করেন গ্রামের স্কুলে এবং গ্রামীণ পরিবেশে সন্তানদের পড়াশোনা করানোর ভালো সুযোগ নেই। তখন তারা শহরমুখী হচ্ছেন সন্তানদের পড়াশোনা করানোর জন্য। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে মাহবুব হোসেন (২০১৫) দেখান যে, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৮-১০ বছর বয়সী ছেলেদের মাঝে ৪৪ শতাংশ থেকে কমে ১২ শতাংশে নেমেছে আর ২০১৩ সালে তা নেমে এসেছে ৩ শতাংশে। অপরদিকে একই বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৮৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত শতাংশের হার কমে আসে ৫৫ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে। একই ভাবে ১৩-১৫ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার কমার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ২৫ বছরে (১৯৮৮-২০১৩) ছেলেদের ঝরে পড়ার হার কমেছে ৩৭ থেকে ১৯ শতাংশে আর মেয়েয়েদের ক্ষেত্রে ৫১ থেকে ৯ শতাংশে (Hossain. M., 2015)।

তবে এর বাইরেও নীরবে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে মানুষের মননে। গ্রামীণ মানুষ এখন পড়াশোনা করানো ও সন্তানদের শিক্ষিত করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। বিভিন্ন কাজে বা প্রয়োজনে নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উনারা শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছেলেদের নয়, মেয়েদের পড়াশোনা করানোকেও তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় পাঠানো হচ্ছে এবং গ্রামগুলোতে দেখতে পাওয়া যায় নারী শিক্ষার্থীরাও দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন।

এক্ষেত্রে জামালপুরের একজন বলেছিলেন: " আমি যেমন চোখ থাকতে অন্ধ আমার পুলা মাইয়াকে তেমনটা বানাইতে চাই না। আমার সামনে কোনো একটা কাগজে কিছু লেখা থাকলেও আমি পড়তে পারিনা। মানুষ আমারে সহজেই ঠকাইতে পারবে, কিন্তু আমার যদি লেখা পড়া থাকে তাইলে আমারে কলমের খোঁচা দিয়া ঠকাইতে পারবে না। শিক্ষা মানুষের চোখ মুখ ফুটায়। এই সম্পদ কেউ কারো কাছ থেকে নিতে পারে না।"

আবার, কুমিল্লার একজন বয়স্ক ব্যক্তি বলেন: "কৃষক আর এখন তার ছেলেকে কৃষি কাজ করতে দিতে চায় না। কৃষি অনেক কষ্টের। এখনকার ছেলে মেয়েরাও কষ্টের কাজ করতে চায় না। সবাই চাকরি নাহয় ব্যবসা করতে চায়।"

এখন মানুষের 'রুচির পরিবর্তন হয়েছে' এই কথাটি আমরা গবেষিত গ্রামগুলোতে বিভিন্নভাবে শুনতে পেয়েছি। রুচির পরিবর্তন যদিও অনেকক্ষেত্রে চোখে দেখা যাচ্ছে, তবে সেটা শুধুমাত্র রুচির পরিবর্তনের ফলাফলটুকু। মানুষের মননে যে পরিবর্তন এসেছে তা তার বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক প্রত্যাশার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে মানুষ এখন রুচি অনুযায়ী পোশাক পরতে চায়, খাবার খেতে চায় এবং তার রুচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়।

ব্যক্তিগত প্রত্যাশা পূরণের পাশাপাশি মানুষের মাঝে তার নিজের চারপাশ, তার বসবাসের জায়গা নিয়েও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। গবেষণাকালীন সময়ে মানুষের এই প্রত্যাশার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাদের বিভিন্ন শব্দমালায়, যেমন—'পরিবেশ তৈরি করা', ও 'টাকা কাজে লাগানো' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। তাদের কাছে আমরা যখন এই বিষয়গুলোকে বিস্তারিত জানতে চেয়েছি, "টাকা কাজে লাগানো" বলতে তারা তাদের উপার্জনের টাকা নানা আয়মূলক কাজে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়, প্রবাসী পরিবারগুলো রেমিটেন্স বিনিয়োগ করছেন, স্থানীয় গ্রামীণ বাজারগুলোতে মার্কেট নির্মাণ করছে, দোকান ভাড়া দিচ্ছে, জেলা কিংবা উপজেলা সদরের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে দেখা যায় পাকা বাড়ি নির্মাণ করে অনেকেই ভাড়া দিচ্ছে। কৃষিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সাথে সাথে এই প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবসার সাথেও গ্রামীণ মানুষ যুক্ত হচ্ছে। আবার এই টাকা কাজে লাগানোর সাথে 'পরিবেশ তৈরি করা'র একটা পরোক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। কেননা, 'পরিবেশ তৈরি'র সাথে অর্থনৈতিক সামর্থ্যেরএকটা সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশ তৈরি করা বলতে তারা মূলত তাদের চারপাশের বা বসবাসের জায়গার বিভিন্ন পরিবর্তন যা তাদের ভাষায় 'বাড়িঘরের উন্নয়ন' তাকে নির্দেশ করেছেন। সেক্ষেত্রে বাড়ির বিন্যাস পাল্টানো, বাড়ির চারপাশে দেয়াল করা, ঘরগুলো পাকা করা বা 'বিল্ডিং' করা, বাড়িতে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, গোসলের স্থান, টয়লেট ইত্যাদি পাকা ও দেয়াল করা ইত্যাদি কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করা যায়। আর এই অবকাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নগরকে অনুকরণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যার ভিতর দিয়ে মানুষের স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষার একধরনের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। আর এই পরিবর্তনের গতিমুখ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিত থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় উদারনৈতিক বিশ্বায়নের নাগরিক হয়ে উঠার দিকে।

"রুচির পরিবর্তন" ও "পরিবেশ তৈরি করা"—মাঠের দুটি শব্দমালা

আমরা মূলত গ্রামীণ জীবনের ধ্যান-ধারণার প্রেক্ষিতে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে সে বিষয়গুলোকে আলাদাভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তবে সামাজিক ঘটনার মিথস্ক্রিয়া এতটাই জটিল যে, আলোচনার খাতিরে অনেক দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো দিয়েও অনেকক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, মানুষের এই অদৃশ্য পরিবর্তনগুলো সামাজিক দৃশ্যমান ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ফলত দৃশ্যমান ক্রিয়াকে, অনুষঙ্গকে আলাদা করা যায় না যেমন, তেমনি মানুষের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, রীতি, বিশ্বাস ইত্যাদিকেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা থেকে আলাদা করা যায় না।

মাঠকর্মের সময়ে উঠে আসা বিভিন্ন শব্দমালা আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বুঝতে সহায়তা করেছে। যেমন—আমরা যখন মাঠকর্ম করি তখন গ্রামের মানুষদের সাথে আলাপ করে দেখতে পাই, তাদের

জীবনমানের "উন্নয়নের" ধারাতে 'আধুনিকতার' তথা নগরের হাওয়া লাগার প্রেক্ষিতে যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে তাদের গ্রামীণ "রুচির পরিবর্তন" হচ্ছে। আবার অনেকে জানিয়েছেন তারা তাদের গ্রামীণ জীবনে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র সব কিছুতেই পরিবর্তন হয়ে একটা 'পরিবেশ তৈরি হচ্ছে'। এখানে 'পরিবেশ তৈরি করা' শব্দটি গ্রামীণ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশেষ এক দ্যোতনা তৈরি করে যা মূলত আধুনিক নাগরিক জীবন মানের দিকে নির্দেশক। এক্ষেত্রে স্বপন আদনান (২০২২) রুচি ও চাহিদার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি কর্তৃক শহুরে আধুনিক পণ্য চাহিদা সৃষ্টির যে চালচিত্র বর্ণনা দেন সে প্রক্ষিতে আমরা দেখতে পাই এই নাগরিক আধুনিক পণ্যের নতুন চাহিদা কেবলমাত্র বাজারকে পরিবর্তন করে না সাথে সাথে নতুন এক সাংস্কৃতিক আবহের ব্যাপ্তি ঘটায়। স্বপন আদনান গ্রামীণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে শহুরে জীবনধারা গ্রামীণ সমাজে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে দেখেন। আমাদের গবেষণায় তার এই পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি দেখতে পাই, গ্রামে আন্তর্জাতিক, অভ্যন্তরীণ উভয় অভিবাসন এই পরিবর্তনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। আপাতদৃষ্টিতে, গ্রামের মানুষ এই 'পরিবেশ তৈরি করা' বলতে দৃশ্যত গ্রামের চারপাশের পরিবেশে ও জীবনমানের অবকাঠামোগত পরিবর্তনকে নির্দেশ করলেও এর পেছনে এই দৃশ্যগত পরিবর্তন সাধনের যে স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা তা ফুটে উঠে তাদের অভিব্যক্তিতে। মানুষের জীবনমান বিষয়ক ধ্যান-ধারণার যে পরিবর্তন এসেছে তা অনুধাবন করা যায়। এখানে দেখা যায় মানুষের আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা, শিক্ষা, অভিবাসন, প্রযুক্তি, জীবনকে সহজকরণ ইত্যাদি নানাবিধ প্রভাবক মানুষের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

এখানে একটা বিষয় আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হিসাবে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান নয়াউদারনৈতিক বাজার ব্যবস্থার অর্থনৈতিক রাজনীতির কাঠামোতে আধুনিকায়নের সুপারিশকৃত উন্নয়নধারা দিনশেষে বাণিজ্যনির্ভর নগরায়নের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার যে স্রোত, সেটা সমাজের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনে পরিলক্ষিত হয় নানাভাবে। উদাহরণ হিসাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তারের ফলে বিনোদনের মাত্রায় যে পরিবর্তন, কিংবা সামাজিক যোগাযোগে যে পরিবর্তন এসেছে, কিংবা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যে অভ্যাসগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া যায়। গ্রামীণ সামাজিক জীবনের মনন ও মূল্যবোধ বিষয়ক যে পরিবর্তন তা আচমকা কোন ঘটনা নয় ববং এটি ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তনের দিকে আগায়। আর এই প্রেক্ষিতেই পরিবর্তন যে একটি চলমান প্রক্রিয়া তা আবারো স্পষ্ট হয়ে সামনে আসে।

পরিবর্তনের বহুমাত্রিকতা

গ্রামীণ মানুষের প্রেক্ষিত থেকে গত তিন চার দশকে গ্রামীণ সমাজে যে পরিবর্তনের চিত্র আমরা দেখতে পাই তাতে দেখা যায় পরিবর্তন একটি চলমান বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানা প্রেক্ষিতের সাথে সাথে প্রযুক্তির বিকাশ, মানুষের অভ্যাস, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, মনন, দৃষ্টিভঙ্গি বিবিধ বিষয় পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। গ্রামের মানুষ তাদের চারপাশে পরিবর্তনকে চারপাশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তির বিকাশ নানান প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে অনুধাবন করেন। তাদের প্রাত্যহিকতার গল্পগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কোন একটা পরিবর্তনের কথা যখন

তারা বলছেন তখন তাদের চারপাশের সামগ্রিকতাকে মাথায় রেখে বর্ণনা করছেন। দেখা যায়, সবগুলো গ্রামেই স্থানীয়রা বলেন যে, গ্রামীণ মানুষের আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বর্ণনা করতে তারা যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন, অভিবাসন, শিল্পায়ন, প্রযুক্তির বিকাশ, শিক্ষা, মানুষের রুচি, আকাঙ্ক্ষা, বাজারের বিস্তার, মানুষের ভোগপ্রবণতাসহ নানান প্রেক্ষিতকে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। সামাজিক এই ঘটনাবলি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এর সাথে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যুক্ত করে নয়াউদারনৈতিক বৈশ্বিক বাজারব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের বাস্তবতা। এরই সাথে, নতুন বৈশ্বিক সংস্কৃতি স্থানিকতার সীমানা দুর্বল করে তোলে এবং একটি সীমানাহীন বিশ্বের উত্থানকে নির্দেশ করে। বিশ্বায়ন একভাবে একটা জাতি আরেকটি জাতির সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রসারিত করে। কেউ কেউ মনে করেন যে এটি এমন এক ভোক্তা সংস্কৃতির উত্থান ঘটায় যা কেবলই সাধারণ ভোগ নয় (Naim, M., 2002)। ভোগ সংস্কৃতি এমনই একটা বিষয় যা কেবল মাত্র বাজারের পণ্যের চাহিদা ও ক্রয়ক্ষমতা মাফিক নির্ধারিত নয় বরং আরো বেশি কিছু। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়, একটা প্রভাবশালী সংস্কৃতি অন্য আরেকটি সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে আর সেখানে দেখা যায় অর্থনৈতিক বাজার ও পণ্য নির্ভরতার প্রভাব নৈতিক মূল্যবোধের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হিসেবে হয়ে উঠে (Rahman, K. A., 2014)। বার্জার (২০০২) ক্রম বিকাশমান বিশ্বায়নের সংস্কৃতি পর্যবেক্ষণে দেখান যে, এই বৈশ্বিক সংস্কৃতির উপাদানের বেশিরভাগই পশ্চিমা এবং আমেরিকান সাংস্কৃতিক বলয় থেকে উদ্ভূত। আর এই বৈশ্বিক সংস্কৃতি অভিজাত ও জনপ্রিয় উভয় স্তরেই ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে বিশ্বের বাকি অংশে বিস্তার লাভ করছে।

পরিবর্তনের জটিল বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপটে আমরা বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি বদলের ক্ষেত্রে আমরাও দেখতে পাই যে, এই প্রেক্ষিতগুলো একটি অন্যটির সাথে কখনো প্রকটভাবে, আবার কখনো বা প্রচ্ছন্নভাবে সম্পর্কিত। এখানে উদাহরণ হিসেবে কিছু বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত কর যায় যেমন গ্রামীণ পরিবার কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি গ্রামীণ পারিবারিক, সামাজিক যৌথতা দিনকেদিন ভেঙ্গে পড়ছে, এই দৃশ্যত পরিবর্তন গুলোর সাথে মানুষের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার পাশাপাশি সামাজিক নানান বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রীতি-রেওয়াজ প্রভৃতিতে পরিবর্তনের প্রেক্ষিত সম্পর্কিত। আবার যদি আমরা মানুষের চারপাশের পরিবর্তনকে দেখতে চাই আমরা তাদের ভাষ্যে 'পরিবেশ তৈরি করা' এর মতো শব্দকে খুঁজে পাই যা মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানান প্রেক্ষিতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের একটা চিত্র প্রকাশ করে।

অপর দিকে, আমরা যখন গ্রামীণ উৎসব ও বিনোদন পরিসরের পরিবর্তনের দিকে তাকাই তখন মানুষের কর্মব্যস্ততা, অবসর কমে যাওয়া, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার নানান প্রেক্ষিতের সাথে মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনকে বুঝতে হয়। গ্রামীণ সামাজিক জীবনে কৃষি এখনও গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রেক্ষিত যার দৃশ্যত পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবিধ কৃষি মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হচ্ছে।

গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক পরিসরে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাজারনির্ভর কৃষি, প্রযুক্তির ব্যবহার, ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা ও চুক্তিসমূহের পরিবর্তন নানা মাত্রায় সম্পর্কিত। এর পাশাপাশি গ্রামীণ খেলাধুলা, বিশ্বাস, মনন, প্রথা, রীতি নানা বিষয়ে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈশ্বিক বাজার ব্যবস্থা, বিশ্বায়নের সংস্কৃতি বিস্তারের সাথে সম্পর্কিত। ফলে, আমরা গ্রামীণ সাংস্কৃতির পালাবদলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, এই পরিবর্তনগুলো অনেক সময়ই স্থানিকতা আর বৈশ্বিকতার সংমিশ্রণে সংকরায়িত হয় আর এই সংকরায়নে কিছু মূল্যবোধ কিংবা অনুষঙ্গ হারিয়ে যাওয়ার আকুতি দেখা যায়, আবার একই সাথে নতুন তথা 'আধুনিকতা'কে ধরার আনন্দ ও উদযাপন। গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তনের গতিমুখ বাজারনির্ভর 'আধুনিকায়ন' মুখী। গ্রামীণ সমাজে মানুষের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও মনন-মানসিকতা প্রভৃতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় নয়াউদারনৈতিক বৈশ্বিক সাংস্ককৃতিক ও আধুনিকায়নের আবহে আবৃত।

ফলশ্রুতিতে আমরা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক বদলের প্রেক্ষিতে অনুধাবন করি যে, কোনো একটি পরিবর্তন নির্দিষ্ট একক কোনো কারণে সংঘটিত হয় না, বরং জটিল এক সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আগায়।

পরিবর্তনগুলো কিছু সময় খালি চোখে দেখা যাচ্ছে, কিছু সময় তা আমরা অনুধাবন করতে পারি গবেষিত গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এমনকি যারা এই পরিবর্তনগুলোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তারাও অনেক সময় এসব পরিবর্তন নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করে না। কিন্তু নিজেদের জীবনের একটি বড় সময়ের ব্যবধানে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন আলোচনা করে, তখন তারা পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করতে পারে। এই পরিবর্তনগুলোর একটিকে অপরটি থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। পরিবর্তনগুলো যেমন একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তেমনিভাবে নির্দিষ্ট কোনো কারণে গ্রামীণ জীবনে এই পরিবর্তনগুলো কতোটা ঘটছে তাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। আমাদের গবেষণা তথ্য থেকে আমরা যেমন দেখতে পারি যে, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ ঘরবাড়ির গঠন, বিভিন্ন আয়োজনের ধরন পাল্টাচ্ছে, কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে মানুষের আয় বেড়েছে। তেমনিভাবে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে তাও গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। পরিবর্তনের এই আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল, মূল্যবোধের এই পরিবর্তনও আপনাআপনি ঘটেনি বরং তার পেছনেও নানাবিধ প্রভাবক কাজ করেছে। গ্রামীণ সমাজ জীবনের এই নানামুখী জটিল পরিবর্তনের জালকে তাই শুধুমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট প্রভাবকের প্রভাব দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। পরিবর্তনের পেছনের কারণকে দেখতে হবে প্রভাবকগুলোর আন্তঃসম্পর্কের মধ্য দিয়ে, যেখানে প্রভাবকগুলো একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে নানান ভাবে বিভিন্ন পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে। আবার একই সাথে প্রভাবকগুলোও একে অপরকে প্রভাবিত করছে।

প্রাথমিকভাবে আমরা গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের পেছনে কিছু প্রভাবক চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি, যেখানে প্রভাবকগুলোর প্রভাব গবেষিত এলাকার বাসিন্দাদের জীবনে মূর্ত না হলেও, প্রভাবগুলো নানাভাবে অনুধাবন করা যায়। আমাদের গবেষণায় আমরা গ্রামীণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রভাবক হিসেবে অর্থনৈতিক

অবস্থার পরিবর্তন, প্রযুক্তি, শিক্ষা, অভিবাসন ও যাতায়াত ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব দেখতে পাই। এই প্রভাবকগুলো নানাভাবে গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাপনকে প্রভাবিত করেছে।

পরিবর্তনের প্রভাবকসমূহ

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব

গ্রামগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, গ্রামীণ জীবনের নানা পর্যায়ের বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, বিভিন্ন আয়োজন, সামাজিক সম্পর্ক, জীবনযাত্রার পরিবর্তন এসেছে তা গ্রামীণ জীবনে অনেটাই দৃশ্যমান। তবে প্রত্যেকটি পরিবর্তনের দৃশ্যমান জায়গার সাথে সামাজিক মনন পরিবর্তনের অদৃশ্য সম্পর্ক আমরা অনুধাবন করতে পারি। গ্রামগুলোতে আমরা জানতে পারি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক যে পরিবর্তন দেখা যায় তার মধ্যে মানুষের আয় বাড়ার কথা শোনা যায়, দেখা যায় এর ফলে মানুষ বিভিন্ন আয়মূলক কাজে নিজেকে জড়ানো শুরু করেছে, আগের তুলনায় সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। চাহিদা বাড়ার সাথেসাথে সবাই তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে কীভাবে কাজে যুক্ত হওয়া যায়, তা নিয়ে ব্যস্ত হতে দেখা যায়। এর ফলে যেসব কাজ করা আগে সামাজিকভাবে হেয় করা হত, সেসব কাজেও মানুষ যুক্ত হওয়া শুরু করে। মানুষ যেমন নানান কাজে নিজেকে যুক্ত করেছে, তেমনিভাবে প্রযুক্তির পরিবর্তন মানুষের কৃষি আয় বৃদ্ধি করেছে, আয়ের নতুন উৎস খুঁজে বার করতে সাহায্য করেছে; সামগ্রিকভাবে আয়মূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ গ্রামীণ জীবনে বেড়েছে। ফলে এখানে কয়েকটি ঘটনা একসাথে ঘটতে থাকে। একদিকে মানুষের আয়কেন্দ্রিক পরিবর্তন আসছে, মানুষ নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত করছে; অন্যদিকে গ্রামীণ জীবনে আয়মূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র বাড়ছে আবার অভিবাসনও বাড়ছে। এদের সম্মিলিত প্রভাবই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনে দেখা যায়।

সবুজ বিপ্লবের পর কৃষিতে যে আয়বৃদ্ধি শুরু হয়, তার ধারাবাহিকতা ও প্রভাব আমরা গত ২-৩ দশকের গ্রাম পরিবর্তনে দেখতে পাই। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রভাবে এক বা দুই ফসলের জমিগুলোতে এখন দুই বা তিন ফসল উৎপাদন করা যাচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যয়, সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির যোগানভিত্তিক কৃষি খরচের পরও জমিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাথে সাথে কৃষি থেকে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও কৃষিকাজ থেকে আয় মূলত মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয় বলেই আমাদের গবেষিত গ্রামের বাসিন্দারা মনে করে। ফলে নগদ টাকা আয়ের জন্য কৃষিকাজের পাশাপাশি তারা কৃষিপ্রযুক্তি সেবা দিচ্ছে কিংবা ভাড়া দিচ্ছে। তবে চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের খাদ্য নিরাপত্তায় উন্নতি ঘটেছে, যা আমরা গ্রামীণ জীবনের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মধ্য দেখতে পাই। পাশাপাশি খামারভিত্তিক কৃষির প্রবণতা বেড়েছে, ফলে এখন আমরা গ্রামগুলোতে পোল্ট্রি বা মুরগির খামার, মাছের খামার, হাঁসের খামার ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছি। পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গৃহপালিত পশুপালন, বিভিন্ন ফসল যেমন আঁখ,

ভুট্টা ইত্যাদির উৎপাদন বাড়তে দেখছি। এছাড়া হাওর এলাকায় আমরা দেখতে পাই আগে হাওরের মাছ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকলেও এখন জলমহালের মাধ্যমে হাওরের মাছও দখল করা হচ্ছে এবং বাণিজ্যিক কারণেই তা করা হয়। বাড়ির পাশে উৎপাদিত শাক-সবজি আগে বিক্রি করার প্রবণতা না থাকলেও এখন তা বিক্রি করা হয়। এছাড়াও আয়ের বহুমুখীতা ও নগদ টাকা উপার্জন বেড়ে যাওয়ায় আগে যারা বর্গা বা আধিতে কৃষিকাজ করতো বা ফসল ফলাতো, তারা এখন ভূমিমালিকের কাছ থেকে নিজেরা জমি ইজারা বা বন্ধক নিয়ে জমি চাষ করে। ফলে কৃষক, ভূমিমালিক, কৃষিশ্রমিকের মধ্যে ক্ষমতার যে সম্পর্ক ছিল, গ্রামীণ সমাজের নানা জায়গায় তাতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিংবা হারিয়ে যাচ্ছে ঢেমি ধানকেন্দ্রিক সংস্কৃতিক প্রথাগুলো মতো নানান আচার, রীতি, চর্চা, প্রথাসমূহ।

বিশ্বায়নের যে ঢেউ তা আছড়ে পরার চিহ্ন রয়েছে আমাদের গ্রামগুলোতেও। গ্রামীণ বাজার যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক বাজারের সাথে। পরিবর্তন এসেছে মানুষের ভোগ্যপণ্যে এবং আয়ের উৎসে। নারীদের আগে বাইরে কাজ করা সামাজিক ভাবে ভালো চোখে দেখা না হলেও বৈশ্বিক পোশাক কারখানা বা গার্মেন্টস মহিলাদের আয়ের সাথে যুক্ত করছে। শ্রমিক হিসেবে বৈশ্বিক অভিবাসন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, এবং এ স্রোতে যুক্ত হয়েছে নারীরাও।

ফলে মানুষের আয় বাড়ছে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, আবার বাড়ছে গ্রামের বাজারে বৈশ্বিক পণ্যের উপস্থিতিও। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে দোকান ও বাজারের সংখ্যা। গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন পণ্য ব্যবহারে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি তৈরি হয়েছে নতুন নতুন আয়ের উৎস। অনেকে বহুজাতিক বা দেশিয় বিভিন্ন কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে, ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলে নিচ্ছে, অনেকে করছে ফ্রিল্যান্সিং। কেউ কেউ অনলাইনভিত্তিক উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছে এবং উঠছে; আবার অনেকে দর্জি, বিউটিশিয়ান ইত্যাদি পেশায় নিজেকে স্বাবলম্বী করছে। ফলে পণ্য ও সেবা ভোগে গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আমরা দেখতে পারছি।

প্রযুক্তির প্রভাব

গত দুই দশকে গ্রামীণ সমাজে নানা রকম প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। প্রযুক্তি প্রবেশ করেছে ঘরের কাজের ক্ষেত্রে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে, বিনোদনের ক্ষেত্রে এবং এর বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করেছে মানুষের মূল্যবোধে, প্রাত্যহিক জীবনে, সামাজিক সম্পর্কে কিংবা বিয়ের মত সামাজিক প্রতিষ্ঠানে। গ্রামীণ জীবনে গত ২৫-৩০ বছরে রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, টেলিভিশন, ডিশক্যাবল, ইন্টারনেট, মোবাইল, কম্পিউটার, রাইস কুকার, ফ্রিজ, ব্লেন্ডার মেশিন, বৈদ্যুতিক বাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, ধান প্রক্রিয়াজাত করার বিভিন্ন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর প্রভাব গ্রামীণ জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

প্রযুক্তি, বিশেষত মোবাইলের বহুল প্রচলন শুরু হওয়ার পর মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একটি বড় পরিবর্তন এসেছে। রাত করে ঘুমাতে যাওয়ার জন্য বেশিরভাগ গ্রামের মানুষরাই মোবাইলকে একটি বড় কারণ মনে করেন। তবে মোবাইলের পাশাপাশি কৃষিপ্রযুক্তির পরিবর্তনের প্রভাবও আমরা দেখতে পাই। কৃষিপ্রযুক্তির প্রভাবে কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় আগের চেয়ে কমে গিয়েছে। ফলে পূর্বের মত সূর্য উঠার আগে

জমিতে যেয়ে কাজ শুরু করতে হয় না। ফলে লোকজন দেরিতে ঘুমিয়ে দেরি করে উঠতে পারেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রূপচর্চার বিভিন্ন সামগ্রী সম্পর্কে মানুষ সহজে জানতে পারে এবং তারা সেসব পণ্য ব্যবহারে আগ্রহী হয়। ফলে রূপচর্চার ধারণায় পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটের প্রভাবে গ্রাম এলাকায় পর্নোগ্রাফি ও মোবাইলে জুয়া খেলার প্রবণতা বেড়েছে যা গবেষিত এলাকার বাসিন্দারা 'মূল্যবোধের অবক্ষয়' হিসেবে উল্লেখ করে। আবার একইভাবে, কৃষি প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে গ্রামীণ কৃষকের সাথে, কৃষি জমি, কৃষিশ্রমিক ও গৃহপালিত পশুর সম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে।

বিনোদনে প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি মূলত ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে। রেডিও থেকে শুরু করে পরবর্তীতে ক্যাসেট বা সিডি প্লেয়ার, টেলিভিশন, ডিশ সংযোগ এবং পরবর্তীতে মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি। বিনোদনের পূর্বতন উৎসগুলোর জায়গা বেশিরভাগই বর্তমানে মোবাইল ও টেলিভিশন দখল করে নিয়েছে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ব্যবহারও ধীরে ধীরে কমে আসছে। গ্রামীণ খেলাধুলার একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল গেমস। এছাড়া প্রায় সববয়সী মানুষদেরই নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিনোদনের উৎস ইন্টারনেট থেকে খুঁজে নেয়। বয়স ও লিঙ্গভেদে গ্রামীণ বিনোদনে প্রযুক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কেউ হয়তো ইন্টারনেটে ভিডিও গেমস খেলছে, কয়েকজন একসাথে মোবাইলে লুডুর মত পুরানো খেলাই খেলছে আবার কেউ হয়তো ওয়াজ বা কীর্তন শুনছে, কার্টুন দেখছে, কেউ শুনছে গান, কিংবা টিভিতে ধারাবাহিক নাটক দেখছে। সন্ধ্যায় অনেকে মিলে চায়ের দোকানে বসে টিভিতে খেলা দেখছে কিংবা সিনেমা দেখছে। মূলত বিনোদনের নানান ক্ষেত্রে প্রায় সবটুকু চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিই গ্রামীণ জীবনে বিনোদনের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে নিচ্ছে।

আবার প্রবাসী ছেলের সাথে মোবাইলেই বিয়ে পড়ানোর প্রচলনও আমরা দেখতে পেয়েছি আবার একই সাথে গ্রামের বাসিন্দারা বলে যে, অনেকসময় মোবাইলের মাধ্যমে অনেকে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়াচ্ছে বা পরকীয়া করছে; ফলশ্রুতিতে অনেক সময় বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটের কল্যাণে দূরে বা বিদেশে থাকা আত্মীয় বা পরিবারের সদস্যের সাথে গ্রামবাসীরা এখন সহজে যোগাযোগ করতে পারেন। এর ফলে যেমন একে অপরের খোঁজ রাখা ও জরুরি খবর পৌঁছানো সহজ হয়েছে, তেমনিভাবে পারস্পরিক সম্পর্কে যোগাযোগের অভাবে যে উদ্বিগ্নতা কাজ করতো তা কমে গিয়েছে বলেও অনেকে মনে করে। একজন মন্তব্য করেন—"আগে মোবাইল যখন ছিল না তখন পাশের বাসার মানুষ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া যেত সহজে। কিন্তু এখন মোবাইল আসার ফলে পাশের বাসায় মানুষের আর খোঁজ পাওয়া যায় না, সবাই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। এখন মোবাইলের মাধ্যমে দূরদূরান্তের মানুষের খবর নেয়ার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে।"[৩৫] এছাড়া গ্রামের বয়স্করা মনে করেন যে, মোবাইলের কারণেই অল্পবয়সীরা এখন বয়স্কদের কম মেনে চলে কিংবা অভিবাবকদের কথা মানে না। তবে এক্ষেত্রে আমরা যেমন দাদা-নাতিকে একসাথে বসে টিভিতে কার্টুন দেখতে দেখেছি, তেমনিভাবে বয়স্কদের বলতে শুনেছি যে, তাঁরা আগের মত নাতি-নাতনিদের সাথে সময় কাটাতে পারেন না কারণ তারা

মোবাইল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সামাজিক বন্ধন ও যোগাযোগে, প্রযুক্তির প্রভাব তাই নানামুখী এবং এই প্রভাব সাধারণীকরণ দুরূহ কাজ।

শিক্ষার প্রভাব

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, মানুষের বহির্মুখী হওয়া, প্রযুক্তি ইত্যাদি মানুষের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব সামনে নিয়ে আসে। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাবে গ্রাম এলাকায় স্কুলের গঠন পাল্টায়, যেখানে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে বেসরকারি ও এনজিওউদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয় কিংবা পড়াশোনা করানোর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি গ্রামগুলোতে স্থানীয়ভাবে অনেক মাদ্রাসা তৈরি হয় এবং কিন্ডারগার্টেন তৈরি হয়েছে। ফলে গত ৩০-৪০ বছরে গ্রামীণ শিক্ষা অবকাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রামীণ মানুষ যেমন শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারে, তেমনিভাবে সামগ্রিক আর্থিক সক্ষমতার উন্নতির ফলে শিক্ষা গ্রহণ শুধুমাত্র সচ্ছল কৃষক বা ধনী পরিবার থেকে বের হয়ে সবার অংশগ্রহণ শুরু হয়। অভিভাবকরা বাচ্চাদের পড়ানোর ব্যাপারে বেশ সচেতন হন। গবেষিত গ্রামে আমরা বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে বা অন্য এলাকায় বাস করার উদাহরণও দেখেছি।

অভিবাসনের প্রভাব

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক উভয় অভিবাসনই অর্থনৈতিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, পরিবারের গঠন, বিয়ে, প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটানোসহ প্রভৃতি পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রেক্ষিত থেকে গ্রামীণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব রাখছে।

অভিবাসনের কারণে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বেশিরভাগক্ষেত্রে অভিবাসীর ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ার চিত্র আমরা গ্রামগুলোতে দেখতে পেয়েছি যা পরোক্ষভাবে গ্রামীণ সামাজিক পর্যায়ে প্রভাব এর সাথে সম্পর্কিত। গ্রামের ভোগ সংস্কৃতির যে পরিবর্তন আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি, তাতেও অভিবাসনের নানান প্রভাবের কথা গ্রামবাসীরা আমাদের বলেছেন এবং আমরা নিজেরাও পর্যবেক্ষণ করেছি। বৈশ্বিক অভিবাসীর ক্ষেত্রে, তাদের দেশে ফেরার সময় সাথে করে চকোলেট, খেজুর, বিভিন্ন প্রসাধনী, সাবান, প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে আসার গল্প গ্রামগুলোর প্রবাসীদের কাছে এবং বাসিন্দাদের কাছে আমরা শুনেছি। আবার অভ্যন্তরীণ অভিবাসীর ফেরার সময় নতুন পোশাক নিয়ে আসা বা শহর থেকে বিভিন্ন খাবারের বস্তু নিয়ে যাওয়া পরবর্তীতে গ্রামগুলোতে সেসবের প্রচলনে প্রভাব রাখে।

গ্রামগুলোতে ঘুরে আমাদের মনে হয়েছে গ্রামীণ জীবনে প্রযুক্তি ব্যবহারের বৃদ্ধির পেছনে অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষত মোবাইল, গৃহস্থালি কাজের বিভিন্ন প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রথমদিকে প্রবাসীরা সাথে করে নিয়ে আসতো। এছাড়া প্রবাসে থাকা সদস্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রবাসীদের নিকটজন প্রায় সবাই স্মার্টফোন ব্যবহার করে।

যাতায়াত ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব

গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে গ্রামীণ রাস্তাঘাট। গ্রামীণ জীবনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নতুন যানবাহন, দ্রুততর হয়েছে গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থা। ফলে গ্রামের সাথে শহরের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরের নানা নাগরিক সুযোগ সুবিধা গ্রামীণজীবনে প্রবেশ করতে পারছে সহজে। পাশাপাশি গ্রামীণ প্রচলিত যানবাহনগুলোও কিছুক্ষেত্রে নতুন চেহারা পেয়েছে। পায়ে চালিত রিক্সা, ভ্যান কিংবা বৈঠার নৌকার সাথে সাথে আমরা গ্রামগুলোতে ইঞ্জিনযুক্ত নৌকা ও ভ্যান বা রিক্সাও দেখতে পাই।

পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের নতুন যানবাহন মানুষের পেশায় বৈচিত্র্য তৈরি করছে। নয়াপাড়া গ্রামে আমরা দেখতে পাই যে, আগে যারা কৃষিকাজ করতেন কিংবা কৃষিশ্রমিক ছিলেন তাদের অনেকেই এখন অটোরিক্সা চালানোকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া রাস্তাঘাটের পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ বাজারে বৈশ্বিক পণ্যের প্রসার হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামীণ পণ্যগুলোও এলাকার বাইরের বাজারে যাচ্ছে।

উপসংহার

স্থানীয়দের অনুধাবনের প্রেক্ষিত থেকে গত ৩-৪ দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তন নিয়ে আমাদের গবেষণায় যে বয়ানটি সামনে আসে তা হলো—অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনোসামাজিক, অবকাঠামোগত, পরিবেশগত, কিংবা অভ্যাসগত ইত্যাদি নানা প্রেক্ষিতের আন্তঃসম্পর্কিত (রিলেশনাল) জটিল এক মিথস্ক্রিয়া। দেখা যায়, গ্রামীণ মানুষের আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষ নানাবিধ পেশায় যুক্ত হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে মানুষের ব্যস্ততা আর আয় দুটোই আগের চেয়ে বেড়েছে। আবার, এই ব্যস্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অবসর সময়ও আনুপাতিক হারে কমে আসছে। এই অবসর সময় কমে আসার সাথে প্রযুক্তির বিস্তার, বাজার বিস্তার, যোগাযোগের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ডিজিটাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ডিজিটাল যোগাযোগ বৃদ্ধি সহ নানা প্রেক্ষিত সম্পর্কিত। আর, গ্রামীণ মানুষের বিনোদন জগতের সাথে এই অবসর সময়ের যে সম্পর্ক রয়েছে তা গ্রামীণ সমাজের বিনোদনের ধরন ও উৎসের পরিবর্তনের মাঝে খুব সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ডিজিটাল প্রযুক্তি বিশেষত মোবাইল, ইন্টারনেটের বিস্তৃতি গ্রামীণ অবসর যাপন ও বিনোদনের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বিনোদনের গ্রামীণ আয়োজন, অনুষঙ্গ কিংবা সামাজিক যৌথতার ধরনে যেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তেমনই আবহমান গ্রামীণ বিনোদনের অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে, কিছু হয়তো পূর্বের আবেদন হারিয়ে কোনমতে টিকে আছে। আবার অনেক নতুন ধরনের শহুরে অনুষ্ঠানাদি, বিনোদন গ্রামীণজীবনে যুক্ত হচ্ছে। শুধু বিনোদন বা অবসরযাপনের ক্ষেত্রেই যে শহুরে চল বৃদ্ধি পেয়েছে এমন নয় বরং সামগ্রিক গ্রামীণজীবনে গত কয়েক দশকে শহুরে চল প্রকটতর হয়ে উঠেছে। এই শহুরে চলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠার ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের বিষয়টা নিয়ে মানুষের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই মিশ্রতায় একই সাথে আশাবাদী হওয়া ও নানান হতাশার সুর খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে, গ্রামীণ মানুষের আলাপচারিতায় মোবাইল ফোন

কিংবা ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি বিস্তারের বিষয়ে যে মিশ্রতা উঠে আসে তা উদাহরণ হিসেবে দেখলে আমরা দেখতে পাই, গ্রামের মানুষ মনে করে এই প্রযুক্তি তাদের যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ও বিবিধ প্রেক্ষিতে যেমন উপকার বয়ে এনেছে আবার একই সাথে সমাজিক ও ব্যক্তিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যও এই ডিজিটাল প্রযুক্তিকে তারা দায়ী করছেন (বিশেষ করে অনলাইন জুয়া কিংবা অনলাইন ভিত্তিক অনৈতিক কর্মে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে)। আবার অন্য দিকে পরিবর্তনের কারণে পাওয়া এবং হারানোর যে দোলাচল তা আধুনিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসেবে দেখলে দেখা যায় গ্রামের মানুষ বাজারনির্ভর অজৈব কৃষি পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা স্বীকার করার সময়ে যেমন আশাবাদী হয়ে উঠেন আবার একই সাথে কৃষিজমি, প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্য ইত্যাদির প্রতি বিরূপ প্রভাবের ক্ষেত্রে এই আধুনিক অজৈব কৃষি ব্যবস্থাকে দায়ী করছে। তারা আধুনিক হাইব্রিড ফসলকে যেমন উৎপাদন হার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মনে করছে আবার একই সাথে হারিয়ে যাওয়া দেশিয় বীজ যা গৃহস্থ নিজে তার ঘরে সংরক্ষণ করে রাখতো সেই সব ফসলের জাত হারিয়ে যাওয়ার জন্য আফসোসও করতে দেখা যায়। এমনকি অনেকে এই বিষয়টিকে বাজারের কাছে তথা বহুজাতিক বীজ, সার, কীটনাশক কোম্পানির কাছে জিম্মিদশা হিসেবে দেখে।

বৈশ্বিক বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে "উন্নত", "আধুনিক" হওয়ার যে তাড়না তা মানুষের রুচি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক এমনকি দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বিশ্বায়নের এই সময়ে বৈশ্বিক বাজার সংস্কৃতির যে ব্যাপ্তি তা গ্রামীণ সমাজের মানুষ উপলব্ধি করছে, আর আধুনিকতা ও উন্নয়নের যে বৈশ্বিক চলতি বয়ান তা তাদের প্রাত্যহিক যাপিত জীবনে দৃশ্যমান হয়ে ধরা দেয়। আবার আধুনিকায়নের সাথে উন্নয়নের যে সম্পর্ক তার সাথে গ্রামীণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, ভোগ, জীবনমান, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, মনোভাব, অভ্যাস নানাবিধ প্রেক্ষিতের পরিবর্তন সম্পর্কিত। এছাড়া গ্রামীণ সংস্কৃতির পালা বদলের যাত্রায় অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সম্যকভাবে আধুনিকতার সাথে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় ঘটাতে সহায়তা করছে। প্রবাসী আয় কিংবা সামগ্রিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আকার বৃদ্ধি আধুনিক নানান পণ্য ব্যবহারের বিস্তার ঘটাচ্ছে যা একভাবে নানান চিরায়ত সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ বা ঘটনাবলির রূপ বদলের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করছে। এখানে গ্রামীণ দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও পণ্যসমূহের পরিবর্তনের দিকে তাকালে আধুনিক নাগরিক সকল পণ্যের দেখা মেলে বেশিরভাগ গ্রামেই। মানুষের প্রাত্যহিক অভ্যাস, ব্যবহার, আচার-আচরণ, চলন-বলন কিংবা বিনোদনের প্রেক্ষিতসহ নানা বিষয়ে আধুনিকায়নের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, এই গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়াতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য—দুই ধরনের প্রেক্ষিতের দেখা মেলে। আর এই পরিবর্তনের কার্যকারিতায় নিয়ামক হিসেবে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে আসে, সেগুলোর মাঝে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিধি বিস্তারকে সবার আগে বিবেচনায় নিতে হয়, এখানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অভিবাসন আয় বা রেমিটেন্সের প্রবাহ, কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ আয়মূলক খাতে প্রযুক্তির বিকাশ যার ফলে আয়ের সুযোগ ও পেশার বহুমুখিতা তৈরি হচ্ছে। এর পাশাপাশি, গ্রামীণ সমাজের যোগাযোগ অবকাঠামোতে (ভৌত এবং ভার্চুয়াল) সাম্প্রতিক সময়ের পরিবর্তন গ্রামকে শহরের নিকটবর্তী করার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষিতের সাথে সংশ্লেষিত হওয়ার বাস্তবতায় নিয়ে হাজির করে। ফলে,

স্থানিকতার সাথে নাগরিক সংস্কৃতি আবার একভাবে আন্তর্জাতিক বাজার ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হতে দেখা যায় গ্রামীণ সংস্কৃতিকে। এক্ষেত্রে, গ্রামীণ সমাজে উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিগুলোতে শিক্ষার প্রতি ও শহরমুখী হওয়ার দিকে ঝোঁক বাড়া, গ্রামীণ মানুষের রুচিবোধ ও অভ্যাসে নতুন প্রেক্ষিত যুক্ত করে। গ্রামীণ শিক্ষিত এই শ্রেণির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজি তৈরির মধ্য দিয়ে তাদের হ্যাবিটাসে (Habitus) এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা ফ্রান্সের সমাজ বিজ্ঞানী পিয়েরে ব্যুর্দ্যোর (Pierre Bourdieu, 1930-2002) পুঁজি ও হ্যাবিটাস বিষয়ক ধরাণায়নের সাথে সামঞ্জস্য প্রকাশ করে, মানুষ সমাজে বিভিন্ন প্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং সামাজিক বিবিধ ক্ষেত্র অতিক্রম করে, এই প্রেক্ষাপটগুলোর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার অভিজ্ঞতা ব্যক্তির হ্যাবিটাসে (মানসিক ও শারীরিক অভ্যাস) গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভ্যাস অন্তর্ভুক্ত করে। আপাতদৃষ্টিতে, হ্যাবিটাস টেকসই এবং তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হলেও, এটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তা পরিবর্তনশীল। একজন ব্যক্তির আচরণ এবং অভ্যাস তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতিফলন করে, এবং সেই ইতিহাস সর্বদা পরিবর্তন এবং বিকাশের জন্য উন্মুক্ত (Huang, X., 2019)। আবার একই সাথে, গ্রামীণ এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাত্যহিক জীবন ও সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রামীণ সমাজে অনেকক্ষেত্রেই আধুনিকায়নের তথা উন্নয়নের স্বরূপ হিসেবে বিবেচিত ও অনুকরণীয় হয়ে উঠতে দেখা যায়।

তথ্যসূত্র

Berger, P. L., & Huntington, S. P. (Eds.). (2002). *Many globalizations: Cultural diversity in the contemporary world*. Oxford University Press, USA.Chayanov, A. V. (1931). The socio-economic nature of peasant farm economy. In A systematic source book in rural sociology (Vol. 3).

Clandinin, D. J., & Caine, V. (2013). Narrative inquiry. In *Reviewing qualitative research in the social sciences* (pp. 166-179). Routledge.

Choudhary, K. (2007). Globalisation, governance reforms and development. In *Globalisation, governance reforms and development in India* (pp. 22-23).

Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Garden City.

Hossain, M. (2015). Schooling of children: Exclusion and dropout. In M. Hossain & A. Bayes (Eds.), *Leading issues in rural development: Bangladesh perspective*. A H Development Publishing House.

Huang, X. (2019). Understanding Bourdieu-Cultural capital and habitus. *Review of European Studies, 11*(1), 45.

Ingold, T. (1993). The temporality of the landscape. *World Archaeology, 25*(2), 152-174. https://doi.org/10.1080/00438243.1993.9980235

Ito, N. (2003). Intangible cultural heritage involved in tangible cultural heritage.

Kotalova, J. (1996). *Belonging to others: Cultural construction of womanhood in a village in Bangladesh*.

Naim, M. (2002). The new diaspora. *Foreign Policy, July-August*.

Rahman, K. A. (2014). Globalization and cultural transformation: The case of Bangladesh. *Asian Culture and History, 6*(2), 1.

Redfield, R. (1956). *Peasant society and culture: An anthropological approach to civilization*.

White, L. A. (1959). The concept of culture. *American Anthropologist, 61*(2), 227-251.

Wolf, E. R. (1966). *Peasant*. Prentice-Hall.

আদনান, স্বপন (২০২২), *গ্রামবাংলার রূপান্তর: সমাজ, অর্থনীতি এবং গণআন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আরেন্স, ইয়েনেকা ও ব্যুরদেন, ইওস ফান (১৯৮০), *ঝগড়াপুরঃ গ্রামবাংলার গৃহস্থ ও নারী*, পপুলার প্রিন্টিং এজেন্সি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

পার্থ সাহা, রঞ্জন (২০২৪), *একুশ শতকের গ্রাম ও কৃষক সমাজ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) is a prominent Southern social science research and academic institute. BIGD is a part of Brac University—a leading Bangladeshi private university with a historically strong social commitment. We conduct rigorous, multi-method social science research, grounded in developing country operations, on a range of social and economic issues to promote practical, time-sensitive innovations for tackling governance and development challenges.

bigd.bracu.ac.bd

BIGDBRACUniversity

BIGD-BRACU

BIGD-BracUniversity

Design: Md. Abdur Razzaque